রমাপদ চৌধুরীকে

॥ এক ॥

সাতটা দশে বোলপুর ছেড়েছি, সাতটা পঁয়তাল্লিশে শেয়ালদা। বিশ্বভারতী-বুলেট স্পীড নিতে না নিতেই বর্ধমান। তারপর ১৪৭ কিলোমিটার পঁয়ত্রিশ মিনিটে কাবার করে কলকাতায় হাজির। হেলিসার্ভিসে আসতে পারতাম, শান্তিনিকেতন-কলকাতা রোজই সাতটা ট্রিপ—কিন্তু আজকাল ট্রেনে চড়া এত আরামের যে,

ওই হেলিকপ্টারে লাইন লাগাতে ভাল লাগে না। ট্রেনে ভিড় একদম নেই, তার উপর ভাল পোশাক পরা না থাকলে কামরায় কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শস্তার হেলিসার্ভিসে। আর টাইম? একেবারে থর্ন টু থর্ন। এই সেদিন লোকসভায় আইন পাশ হয়েছে একত্রিশ সেকেণ্ডের বেশী দেরি করলে ড্রাইভার ও গার্ডের চাকরি খতম।

স্টেশনে বা পথে টিকিট চেকিং আর নেই। এত লোক মিলবে কোথায়? দেশের জনসংখ্যা কমতে কমতে ১২ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বেকার বলতে এখন একমাত্র সদ্যোবন্ধ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কর্মীরা। টিকিটের টুকরো একটা বড় ফুটোওলা বাক্সে ফেলে এগোলাম। চারদিক ঝকঝকে তকতকে। কোণায় কোণায় ফুলের তোড়া, সুবেশা তরুণীর মিষ্টি হাসি। স্টেশন তো নয়, যেন বিলাস-বাগান।

স্টেশন ভবন ছেড়ে একটু এগোতেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। গত সাত-আট বছর ধরে কলকাতার সব ট্যাক্সি-ড্রাইভার মেয়ে। বয়স কুড়ি থেকে বাইশ। যাত্রীদের লাইন নেই, লাইন ট্যাক্সিওয়ালিদের। কারও হাতে রজনীগন্ধা, কারও হাতে গোলাপ, কারও হাতে লাইলাক; প্লাস উর্বশীমার্কা ট্যারচা চাউনি। যাব টালিগঞ্জ, তাই ট্যাক্সিতে ওঠার বাসনা নেই। কলকাতার বেশির ভাগ রাস্তাই ওয়ান-ওয়ে। তাই টালিগঞ্জ যেতে টালা ঘুরতে হবে, সময়ও লাগবে বেশী। তার চেয়ে পাতাল রেল ঢের ভাল। ট্রাম নেই, বাস নেই, এখন কলকাতার যানবাহন বলতে বোঝায় পাতাল রেল, মনো রেল, ট্যাক্সি এবং হেলিকপ্টার। মনো রেল বেশ ভালই, তবে ইদানীং পর পর কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটায় যাত্রী একটু কমেছে। পাতাল রেল এখন কলকাতার সব রাস্তা জুড়ে। দমদম থেকে টালিগঞ্জ কাজ শেষ হতে না হতেই আরও তেইশটা রুটে এখন পাতাল রেল চলছে।

শেয়ালদার সামনে এখন ফোর টায়ার ফ্লাই ওভার। গোড়ায়

তৈরী মিনি উড়াল পুল আর নেই। সেটি ভেঙ্গে বানানো চারতলা রাস্তায় গাড়ির পর গাড়ি ছুটছে। ফুটপাতে হকার নেই, ডাবের খোলা নেই, ঠেলা রিকশা নেই, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ পর্যন্ত নেই। গোটা শেয়ালদা এলাকা ভেঙ্গে দুই বর্গমাইল জোড়া বিরাট একটি সুপার মার্কেট বানিয়েছেন সি. এম. ডি. এ.। তাতে সারা শহরের ২৪৯২৩ জন হকার দোকান খুলেছেন। দেখার মত জিনিস। এশিয়ার মধ্যে নয়, পৃথিবীর মধ্যে সেরা। এই চোখ ধাঁধানো সুপার মার্কেট দেখতে কত টুরিস্টই না রোজ আসেন।

যা বলছিলাম। এসকেলেটারে নেমে গেলাম পাতালে। পরিচ্ছন্নতায় এই স্টেশন ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে গত মসকো কনভেনশনে। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই, কেবল ট্রেনের আসা যাওয়ার আওয়াজ। আমি ৭-চ প্ল্যাটফর্মে ৩০৮।৬ক সোনারপুরগামী ট্রেনে উঠব। দক্ষিণে পাতাল রেলের টার্মিনাস সোনারপুর, উত্তরে বনগাঁ। গঙ্গাসাগর থেকে বনগাঁ পুরোটাই এখন কলকাতা। আমি নামব রাণীকুঠি স্টেশনে। বড় জোর সাত কি আট মিনিট। উপরের ট্রেনে এখন কম্পিউটার সার্ভিস চালু হয় নি, পৃথিবীতে একমাত্র কলকাতার পাতাল রেলেই সিগন্যালিং ও ড্রাইভিং ইত্যাদি যন্ত্রগণক ও যন্ত্র-মানবের হাতে।

কামরা ভর্তি লোক। সবাই কাগজে বা বইয়ে মুখ গুঁজে। কেউ চোখ বুজে। আমি গাড়িতে উঠে বসা মাত্র একজন বেয়ারা এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এল। গ্রীষ্মে শরবৎ, শীতে কফি। ওটা ফ্রি। চলছি চলছি। মৌলালী, জোড়া গির্জে, পার্ক স্ট্রীট, বেকবাগান পেরিয়ে ল্যান্সডাউনে পড়তেই খেয়াল হল বিশ্বভারতী-বুলেট ট্রেনের কামরায় আমার সোনার কলমটা ফেলে এসেছি। আমি এলগিন স্টেশনে নেমে রাস্তার বুথ থেকে ফোন করলাম শেয়ালদার স্টেশন মাস্টারকে। ফোন সেরে ফিরে আসতেই আর একটা ট্রেন। চেপে বসলাম। নতুন টিকিট কাটার দরকার নেই। আবার সরবৎ এল। খেলাম। মিনিট চার পর রাণীকুঠি স্টেশন। বাড়িতে

ঢুকতেই শেয়ালদার স্টেশন মাস্টারের ফোন: হ্যালো হ্যালো, আপনার পেন পাওয়া গেছে। সেই বিশ্বভারতী-বুলেট ফিরে যাচ্ছিল বোলপুর। বর্ধমানের স্টেশন মাস্টারকে খবর দিলাম। তিনি লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড স্কোয়াডকে পাঠিয়ে পেনটা উদ্ধার করেছেন। ভাগ্যিস আপনার পেনটা সোনার ছিল, তাই পাওয়া গেল; সোনার জিনিস আজকাল কেউ পোছে না। সাত মিনিট আট সেকেণ্ডের মধ্যে আপনার কলম বাড়ি পৌছে দিচ্ছি স্যার।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, থ্যাংক ইউ—

॥ দুই ॥

দশ বছরে বেকার-সমস্যা সমাধান করে প্রধানমন্ত্রী কথা রেখে-ছেন। তারপরেই তিনি যে-কাজটি করলেন, তার প্রশংসায় তামাম হিন্দুস্থান পঞ্চমুখ। লোকসভায় একটি নতুন বিল পেশ করে তিনি পাস করিয়ে নিয়েছেন। বিলটির বক্তব্য হল, যেহেতু বাংলা একটি বিদেশী রাষ্ট্রের ভাষা, সেহেতু তাকে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশীলে

রাখা যায় না। ঢাকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যতই দহরম-মহরম থাকুক, ভিন্ন রাষ্ট্রের একটি জাতীয় ভাষাকে এই মহান ভারতবর্ষে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। বিলটা যখন সংসদে ওঠে, বঙ্গভাষী এম-পি.রা কেউ চিলির সামরিক অভ্যুত্থান, কেউ তুরস্কের খরা, কেউ কাম্পুচিয়ার উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, বিলটা পাস হয়ে যাওয়ার পর 'চক্রান্ত-চক্রান্ত' বলে চেঁচাতে থাকেন। কিন্তু ততক্ষণে বাংলা বরবাদ এবং সারা পশ্চিম বাংলায় হিন্দী চালু হয়ে গেছে। শেঠ গোবিন্দ দাস বা ডঃ রঘুবীর যা পারেন নি, প্রধানমন্ত্রী তা পারলেন। হিন্দীর প্রসারে প্রাণপাত করার জন্যে রাষ্ট্রসংঘ তাঁকে বিশেষ সম্মানপত্র দিয়েছেন। তাঁরই চেষ্টাতে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনের কাজ এখন শুধু ইংরেজী আর হিন্দীতেই চলে। ওই বিরাট বাড়ির তলায় তলায় অনবরত শোনা যায় "নমস্তে" আর "শুক্‌রিয়া"। হিন্দী সিনেমা এবং আমাদের বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে হিন্দী ভাষা আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া জয় করে যেভাবে ইউরোপে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে, তাতে আশাকরা যায় রাষ্ট্রসংঘে ইংরেজীও একদিন বাতিল হয়ে যাবে।

বলছিলাম পশ্চিম বাংলার কথা। হিন্দী চালু হওয়ার পর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। একালের ছেলে-মেয়েরা বাংলা বলে যে কোনকালে একটা চালু ভাষা ছিল তা জানে না। শুধু যাঁরা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁরাই জানেন সুন্দরবন থেকে তরাই বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের লোকেরা একদা বাংলায় কথা বলত। বিহার, আসাম ও ত্রিপুরাতেও অনেকে বাংলাভাষী ছিল। এখন সব হিন্দী। ইংরেজী ছেড়ে হিন্দী মিডিয়াম স্কুলে ছেলে-মেয়েদের পাঠানো হালের ফ্যাশন। সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'তুলসীদাস-সন্ধ্যা' থাকবেই। রুটি আর অড়হর ডাল লোকে অনায়াসে দু' বেলা খায়। সাইনবোর্ড, বাসের নম্বর, মামলা মোকদ্দমা, কথাবার্তা, লেখাপড়া—সব হিন্দীতে। তবে

এই এলাকার হিন্দীটা একটু আলাদা। পশ্চিমীরা বলে 'বাংলী-হিন্দী।' কারণ এখনও বৃদ্ধ কেউ কেউ চাচা না বলে কাকা বলেন, বর্তানিয়া না বলে ব্রিটেন বলেন। বিয়ের সময় উলু দেওয়ার রেওয়াজ এখনও আছে। রসগোল্লা ও চিংড়ি-ইলিশ এখনও অনেকে ভালবাসে। একালের বাঙালী ছেলেরা গর্বের সঙ্গে বলে, তারা বিপ্লবীদের বংশধর, অন্যায় বা অবিচার কোনকালেই বাঙালী সহ্য করে নি, করবেও না। হিন্দীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেও মাছের ঝোল, রসগোল্লা এবং উলুধ্বনি তারা কখনও ছাড়বে না। বাঙালী তার ঐতিহ্য জিইয়ে রাখবেই।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য বাছাই করে অনুবাদ করে নেওয়া হয়েছে হিন্দীতে। বাকি সব 'জয় বাংলা' বলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কাশীর মণিমর্ণিকা ঘাটে। বঙ্কিম চন্দ, শরৎচন্দ, রবিন্দরনাথ এখন নামকরা হিন্দী সাহিত্যিক। একালের ছেলেদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়, হিন্দী সাহিত্যে প্রথম নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন কে, তারা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় রবিন্দরনাথ। তারপরে অবশ্য আরো আটজন হিন্দী সাহিত্যিক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। এখন ভারতের লোক ওটা নিয়ে মাথা ঘামায় না, বরং বিশ্ব হিন্দী পরিষদের দেওয়া এক কোটি টাকার কামধেনু পুরস্কার নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা তোলপাড় হয়। শর্ত শুধু একটিই। সাহিত্যের বিষয় হবে গরু। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা এখন কবীরের নামে চলে। গীতাঞ্জলি যে আসলে কবীরের রচনা, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাই গীতাঞ্জলির প্রত্যেকটি কবিতায় কবীরের ভণিতা জুড়ে দিয়ে বইটির নতুন নাম হয়েছে 'কহত কবীর।' রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে একমাত্র দিনেশ দাস খুব জনপ্রিয়। তুলসীদাস সুরদাস ও দিনেশদাস একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

বাংলা ভাষার চর্চা যে একেবারে উঠে গেছে, তা অবশ্য বলা যায় না। হিব্রু, পালি এবং প্রাকৃতের একই সঙ্গে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু বাংলা

ডিপার্টমেন্টে না পাওয়া যায় অধ্যাপক, না পাওয়া যায় ছাত্র। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও লোক মেলে না। দু' একজন বাংলা জানা লোক এখনও আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা এত বৃদ্ধ যে, বিছানা থেকে নড়তেই পারেন না। যাঁরা বাংলা ভাষা শিখতে আগ্রহী, তাঁরা সরকারী বৃত্তি নিয়ে লণ্ডন, মস্কো ও শিকাগো যান। বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও বাংলা ভাষা চর্চা হয়। আমার নাতির বারো বছরের নাতির বাংলা শেখার বড় শখ। সে কার কাছে যেন শুনেছে ওই ভাষাটা নাকি বহুৎ মিঠা ছিল। ছোকরা মাছের ঝোল ভাত খেতে ভীষণ ভালবাসে। তার জন্যে ওর মা-বাবার কাছে ওকে কম বকুনি খেতে হয় না। সেদিন সে বাড়ির ছাদে বসে আপন মনে গাইছিল— 'মেরে সোনেকি বাংলা, মঁায় তুমকো প্যার করতা হুঁ, সারি উমর তুমহারি আকাশ তুমহারি বাতাস মেরে দিলমে বাঁশি বাজাতা হ্যায়।' গানের শেষে নাতি তার দাদুকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কহিয়ে তো নানাজী, বাংলা মুলুক ক্যায়সে সোনেকি হোতা হ্যায়।'

নাতি দাদুকে কঠিন সমস্যায় ফেলল। সত্যিই তো, গাছপালা নদী মাটি মানুষ সমেত একটা দেশ কী করে সোনার হয়ে যায়। রবিন্দরনাথজী কী সব আজেবাজে গান লিখে গিয়েছেন! তার চেয়ে একালের কবিদের লেখা কত সহজ, কত সুন্দর।

সারা কলকাতার মধ্যে বেলেঘাটার চাউলপট্টিতে ৯৪ বছরের এক বৃদ্ধ থাকেন, তিনিই এখন একমাত্র বাংলা বলতে পারেন, বাংলা বুঝতে পারেন। আর একজন ছিলেন নলহাটিতে। তিনি এই সেদিন মারা গেছেন। বাংলা দেশের সঙ্গে ইদানীং যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় এবং বাংলা দেশ থেকে আর হিন্দু উদ্বাস্তু না আসায় বাংলা চর্চা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। বেলেঘাটায় আমার নাতি তাঁর নাতিকে নিয়ে গেল। পণ্ডিত বংলাল

শর্মার কাছে আজকাল বিশেষ কেউ যায় না। সরকারী বৃত্তির উপর তাঁর সংসার চলে। পণ্ডিতজী ওদের দেখতে পেয়ে ক্ষীণ-কণ্ঠে বললেন, 'আইয়ে আইয়ে।' তারপর সোনেকি বাংলার প্রশ্নটা শুনে বাংলায় বললেন, 'মোশাই, এ তো বোড়ো কাঠিন প্রশ্ন্‌ আছে। রবিন্দরনাথ হামার সাবজেক্ট্‌ না। হামি প্রশ্নটা ঢাকায় ভেজে দিতে পারি, উয়ারা ফয়সালা কোরে দেবেন।' তারপর একটু দম নিয়ে আবার বললেন, 'কী খোঁকা, তুমি বাংলা সমঝো?'

পণ্ডিতজীর বাংলা শুনে নাতির নাতি অবাক্‌। সে তখনই স্থির করে ফেলেছে বাংলা ভাষা আর কোনদিন শিখবে না।

॥ তিন ॥

পশ্চিম বাংলার আক্ষেপ মিটেছে। এখন এই রাজ্যে টুরিস্টের ছড়া-ছড়ি। খাজুরাহো মহাবলীপুরমের চেয়ে কলকাতায় আজকাল বিদেশীরা আসেন বেশী। বেশী ভিড় অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়। 'ক্যালকাটা বাই নাইট' এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। হাজার হাজার লোক রোজই আসছেন। জাম্বো জেটের টাল

সামলাতে একা দমদম পারছে না, তাই সোনারপুরে আর একটা বিরাট এরোড্রোম বানাতে হয়েছে। নাইন স্টার হোটেল, ট্যুরিস্ট লজ, নিউ মুন কটেজ, ফুল মুন কটেজ ইত্যাদিতে ছেয়ে গেছে কলকাতার শহরতলি। পাট বা চা নয়, এখন পশ্চিম বাংলা বেশী বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করে ট্যুরিজমে। কলকাতা, সাঁওতালডি আর ব্যাণ্ডেল—এই তিন জায়গাতেই ট্যুরিস্টদের বেশী যাতায়াত।

হঠাৎ এই ট্যুরিস্ট সমাগমের কারণ আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমে ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বিদ্যুৎ ধার করে এনেছিলেন। তারপর হরিয়ানা, পাঞ্জাব ধার দিতে থাকে। কিন্তু এই রাজ্যগুলি বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্বে এত ঈর্ষাকাতর যে, দুদিন পরেই বিদ্যুৎ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এই না দেওয়ার পেছনে যে গভীর চক্রান্ত আছে তা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশেষে আরো পশ্চিমে এগোতে থাকেন। প্রথমে আফগানিস্তান। সে টাকাই হোক আর বিদ্যুতই হোক, ধার দেওয়ার ব্যাপারে কাবুলীদের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। কিন্তু আফগানিস্তান পর্যন্ত বিদ্যুৎ দিতে দিতে হাল ছেড়ে দিল। তারপর আমরা লেবানন (না, ইজরায়েল থেকে বিদ্যুৎ আমরা কখনও নেব না), যুগোস্লাভিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া—আরো অসংখ্য দেশ থেকে বিদ্যুৎ নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এমন কি ফিজি পাপুয়া প্রভৃতি ছোট দেশও দুই বা তিন মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জোগাতে লাগল। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রুশ শোষনবাদ ও জাপ জঙ্গীবাদ এই দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিম বাংলার বিরুদ্ধে এমন চক্রান্ত করল যে, সব দেশ এই রাজ্যকে বিদ্যুৎ দেওয়া একসঙ্গে বন্ধ করে দিল। বাঙালী জাতি অবশ্য তাতে দমে নি। ভুললে চলবে না, এই বাংলা রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের দেশ। ভিক্ষাকে সে ঘৃণা করে, সব ব্যাপারেই সে নিজের পায়ে

দাঁড়াতে চায়। বিদ্যুতের ব্যাপারেও আমরা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে ঠিক করি, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে কর্মী এবং অফিসাররা যেমন আছেন থাকুন, নতুন রিক্রুটমেণ্টও চলতে থাকুক, তবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

তাই করা হল। এখন আর খবরের কাগজের পাঠকদের মেগাওয়াটের ঘাটতির হিসাব নিতে হয় না, কখন বিদ্যুৎ আসবে বা যাবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না, সাবোতাজ কেউ করল কি না তাই নিয়ে গোয়েন্দা লাগাতে হয় না, সাঁওতালডি বা ব্যাণ্ডেলের কোন্ ইউনিট মেরামত করতে করতেই বন্ধ হয়ে গেল ইত্যাদি বাজে ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না—সারা বাংলাকে আমরা ইচ্ছে করেই অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছি। ক্যাল-কাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তুলে দিয়ে ভিক্টোরিয়া হাউসে নতুন করে একটা ওয়াচ টাওয়ার বানানো হয়েছে। একসঙ্গে তিন হাজার ট্যুরিস্ট একটি আধুনিক শহরে অমাবস্যা কীভাবে গাঢ় হয় বা পূর্ণিমা কীভাবে আলো ছড়ায় ওখানে বাইনাকুলার লাগিয়ে দেখতে পারেন।

বিদ্যুতের পাট পুরোপুরি তুলে দেওয়ার পর বেশ কিছুদিন অসুবিধা হচ্ছিল। এখন হয় না। সন্ধ্যের আগেই রাতের খাওয়া, পড়াশোনা শেষ। সারা পশ্চিম বাংলায় এখন অফিস টাইম সকাল সাতটা থেকে বিকাল তিনটা। ফ্রিজ রেডিও ইত্যাদি বাজে আসবাব বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেওয়া হয়েছে। ইভনিং শো, নাইট শো'র বদলে এখন সিনেমায় মরনিং শো, নুন শো। একমাত্র সিনেমা হল আর হাসপাতালে জেনারেটার ব্যবহার করা চলে। অন্যত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে ফাইন। অর্থাৎ এই মুহূর্তে কলকাতাই একমাত্র বৃহৎ আধুনিক শহর, এবং পশ্চিম বাংলাই একমাত্র রাজ্য যেখানে অষ্টপ্রহর অপ্রদীপ। এই শহরেই শুধু পূর্ণিমা বস্তুটা কী, তিথিগুলোর চেহারা কেমন

বোঝা যায়। বিদেশী ট্যুরিস্টরা প্রকৃতির এই মোহন রূপ দেখতেই এত খরচ করে আসছেন। ভিক্টোরিয়া হাউসের মতো আরো অনেকগুলো ওয়াচ টাওয়ার কাম রেস্তোরাঁ কাম মোটেল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সারা রাজ্যে। শান্তিনিকেতনের ওয়াচ টাওয়ারগুলো খুব একসপেনসিভ। সেখানে প্রতি রাত্রে মেয়েরা তিথি অনুসারে নেচে নেচে গান গায়। কখনও 'ও আমার চাঁদের আলো', কখনও 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো'।

ট্যুরিস্টরা ক্যামেরা বগলদাবা করে তারপর যান ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডি। সেখানে অনেক অনেক বছর আগে ছিল থার্মল পাওয়ার স্টেশন। স্টেশন দুটি তৈরি হওয়ার পর থেকেই বয়লারের টিউবে কয়েক লাখ ছিদ্র উপহার দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেয় নি। বহুদিন অকেজো থাকার পর স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড স্টেশন দুটিকে সম্প্রতি আর্কিওলজিকেল ডিপাটমেণ্টের হাতে তুলে দিয়েছেন। অব্যবহারে এবং জল ঝড়ে স্টেশন দুটি এখন অদ্ভুত চেহারা নিয়েছে। গাঁয়ের লোকেরা বলে বয়লার-বাবার মন্দির। ফুল বেলপাতা দিয়ে ওরা পূজোও দিত। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে পাহারাদার বসিয়ে দেওয়ার পর পূজো আর হয় না। করলে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা নতুবা সোপর্দ করা হইবেক। তবে থার্মল পাওয়ার স্টেশন না বলে 'বয়লার বাবার মন্দির' এখনও বলা হয়ে থাকে। আর্কিওলজিকেল ডিপার্টমেণ্টের খাতাপত্রেও ওই একই নাম। অনেকে বলেন, আসল স্টেশন নাকি মাটির তলায় চলে গেছে। সে যাই হোক, বয়লার বাবার মন্দির দেখতেই ট্যুরিস্টরা খুব যান। কলকাতা-ব্যাণ্ডেল-সাঁওতালডি একটা প্লেন সার্ভিস ঘণ্টায় ঘণ্টায় চলছে। এইরকম ডিজাইনের মন্দির ভারতবর্ষের কোথাও নেই। ট্যুরিস্টদের তাই এত পছন্দ।

আমরাও পছন্দ করি ট্যুরিস্টদের। অকারণ এতদিন 'আলো-আলো' বলে আমরা চেঁচিয়েছি। ভুলে গিয়েছিলাম আমরা

বাঙালীরা মা-কালীর সন্তান। অন্ধকারকে এখন বরণ করে নিয়েছি বলেই তো ঘরে ঘরে সুখ, ঘরে ঘরে শান্তি। ট্যুরিস্ট মারফৎ বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ এত বেশী যে, শতকরা আশীভাগ দিল্লি নিয়ে নিলেও রাজ্যের হাতে থাকে অঢেল টাকা। কলকারখানা বন্ধ, অফিস কাছারি নাম মাত্র, চাকরি-বাকরির দরকার নেই, রোজগারের ধান্দা নেই—ওই বিদেশী মুদ্রার অংশ থেকেই প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে দেওয়া হচ্ছে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে আঁধার-ভাতা। তাতেই হেসে-খেলে চলে যায়।

॥ চার ॥

এয়ারপোর্টে ভীষণ ভিড়। চারদিকে লোক আর লোক। এই তৃতীয় বার ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে ভারতীয় ফুটবল দল দেশে ফিরছে টার্মিনাল বিল্ডিং ছাড়িয়ে ভিড় টারমাকে উপচে পড়েছে। ঠেলাঠেলি চেঁচামেচিতে এক অরাজক অবস্থা। পুলিস নেই। তার কারণ কলকাতার তিনজন উপাচার্য, ছয়টি কোম্পানির

ম্যানেজিং ডিরেক্টার এবং দশটি কারখানার মালিক ওই সময় ঘেরাও থাকায় কলকাতায় প্রায় সব পুলিস ঘেরাওকারীদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে ওই উনিশটি জায়গায় মোতায়েন; এয়ার-পোর্টে পাঠানোর মত অবশিষ্ট আর নেই।

দূর থেকে প্লেন দেখা গেল। আমাদের দল আসছে। জয়ঢাক রামশিঙা পিয়ানো একোর্ডিয়ন ও কাঁসার থালা একই সঙ্গে বাজতে লাগল। এবার ভারত হারিয়েছে তিব্বতকে। তিব্বত এখন স্বাধীন দেশ। তাদের দুর্দান্ত খাম্পা থাণ্ডার্স টিম ফাইন্যালে প্রচুর বেগ দিয়েছে ভারতকে। ব্রাজিল ফার্স্ট রাউণ্ডেই ৯-১ গোলে আমাদের কাছে হেরে যায়। জার্মানি ইংল্যাণ্ড উরুগুয়ে হাঙ্গারি ইত্যাদি দল এখন এলেবেলে। ভারত থেকেই কোচরা যায় ইউরোপ দক্ষিণ আমেরিকায়। প্রতিযোগিতা হয় প্রধানতঃ ভারত তিব্বত সেনেগাল ও মরিশাসের মধ্যেই। এবার খেলা ছিল মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোরে। সেখান থেকেই ভারতীয় দল ফিরছে।

প্লেন নামছে। উল্লাস বাড়ছে। আজ সাতাশ বছর হল কলকাতায় কোন মেয়র নেই। কারণ ইলেকশন হয় না। একটা তিরিশ ফুট উঁচু মঞ্চ বানানো হয়েছে। তাতে মেয়রের বদলে টালিগঞ্জ হাইকোর্টের (কলকাতায় চার লাখ মামলা জমে যাওয়ায় নতুন হাইকোর্ট খোলা হয়েছে গত বছর) প্রধান বিচারপতি মহাদেবপ্রসাদ মিত্র সভাপতিরূপে তাঁদের স্বাগত জানাবেন। পার্ক-সার্কাসের নজরুলভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ লক্ষ্মী চৌধুরী দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানদের প্রধান অতিথিরূপে বরণ করবেন। প্রধান বিচারপতি মহাশয় সাতটি সত্যনারায়ণ পূজার সভাপতিত্ব এবং পাঁচটি গানের জলসার প্রধান আতিথ্য সেরে এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন। ডঃ লক্ষ্মী চৌধুরী এখনও এসে পৌঁছন নি। তিনিও ব্যস্ত মানুষ। শনি পূজার পাঁচালি পাঠ, ব্লকের ক্যারাম প্রতিযোগিতা, শিশু প্রতিভার অন্নপ্রাশন ইত্যাদি

নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রায় প্রতি দিনই উপস্থিত থাকতে হয়। একটু আধটু দেরি তো হবেই।

প্লেন নামল। 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে প্রথমে দেখা গেল ম্যানেজারের মুখ। তিনি প্রচুর ফুলের মালা ও হাততালি নিলেন। তারপর দেখা গেল কোচকে। তিনিও পেলেন হাততালি আর মালা। তিন নম্বর মুখ নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেনের। আবার হাততালি, আবার মালা। তিনজনের পর একে একে নামলেন নন-প্লেয়িং ভাইস ক্যাপ্টেন, ডেপুটি ম্যানেজার, এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার প্রভৃতি কর্মকর্তা আরো আঠারোজন। ঘনঘন ক্যামেরার ক্লিক ও তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁদের মঞ্চে তোলা হল। দলের ম্যানেজার বলখেলাওন সিং জানালেন, খেলোয়াড়রা পরের ফ্লাইটে আসছেন। তাঁদের জন্যে অপেক্ষা না করলেও চলে।

সভাপতি তাঁর দীর্ঘ ভাষণের শুরুতেই বললেন, যাঁরা দেশের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে উলানবাটোর থেকে এইমাত্র ফিরলেন। তাদের সম্মান জানাতে গিয়ে মনে পড়ছে সেই ১৯১১ সালের কথা। এগারো সালের শীল্ড বিজয় এবং এবারের বিশ্ববিজয় এক সূত্রে গাঁথা। সভাপতির বক্তৃতার মাঝখানে প্রধান অতিথি মঞ্চে এসে পড়েছেন। ক্লান্ত, তাই চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। সভাপতি তখনও বলে চলেছেন, ফুটবল বাঙালী বঞ্চনা পেলে সামাদ ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রধান অতিথি যোগনিদ্রা থেকে উঠে শুভমস্তু বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আর একটি অনুষ্ঠানে তার ফিতে কাটার কথা। সভাপতিও ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগলেন।

ম্যানেজার বলখেলাওন সিং সোনার কাপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি কালা-বোবা, তাই তাঁর বদলে কোচ শ্রীগোলমূর্তি পূর্ণসেন্টারম পিল্লাই বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তিনি তামিলে যা বললেন হিন্দী অনুবাদ থেকে বাংলা অনুবাদে তার মর্মার্থ হল, ফাইভ গোলী সিসটেম চালু হওয়ার পর থেকে ভারতকে

ঠেকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য। পাঁচজন খেলোয়াড় সার বেঁধে গোল লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন, বল গোলে ঢোকবার রাস্তা নেই। বাকী ছ'জন খেলোয়াড়ের মধ্যে তিনজন স্টপার, তিনজন স্ট্রাইকার। তিব্বত আর ভারত ছাড়া আর কোন দলই এই ফাইভ গোলী সিসটেম ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে নি। ভারতের আর একটি সুবিধা সব প্লেয়ারকে ট্রেনিং-এর জন্যে বজরংবল্লী ইয়োগ আশ্রমে পাঠানো হয়। তাঁরাই উল্লম্ফন, শীর্ষাসন, ভুজঙ্গাসন ইত্যাদি শিখিয়ে দেন। আমাদের ছেলেরা কখন কীভাবে মাটিতে বসে বা দাঁড়িয়ে বল আটকায় এবং লাফিয়ে ধরে বা মারে প্রতিপক্ষ আন্দাজ করতেই পারে না। আমাদের ফাইভ গোলী যোগ সিসটেমের সঙ্গে একমাত্র পাল্লা দিতে পারে তিব্বতের ফাইভ গোলী তন্ত্র সিসটেম। পর পর তিন বছর ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ানের হ্যাটট্রিক আমরা তো করলামই, আশা আছে চ্যাম্পিয়ানশিপের সেঞ্চুরীও করব।

জনতা হাততালি দিল। কোচ শ্রীগোলমূর্তি পূর্ণসেণ্টারম পিল্লাই গলা ফাটিয়ে বললেন, বজরংবল্লীজী কি। জনতা কোরাসে চেঁচাল —'জয়।' এই জয়ধ্বনির মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল এয়ার-পোর্টের এক কোণে দুটি দলে প্রচণ্ড মারামারি চলছে। গালাগালি হাতা-হাতি মুখখিস্তি। খবর নিয়ে জানা গেল ওরা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। এই দুটি দল বহু আগেই ফার্স্ট ডিভিশন থেকে নামতে নামতে ফোর্থ ডিভিশন থেকেও বিদায় নিয়েছে। দল দুটি নেই বটে, তবে তাদের সাপোর্টাররা রয়ে গেছেন। কলকাতা শহরে এখন একুশটা ফুটবল স্টেডিয়াম। তার মধ্যে একটা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টারদের জন্যে। তাঁরা সেখানে মাঠের মাঝখানে মারামারি গালাগালি করেন এবং গ্যালারিতে টিকিট কেটে একদা-বাঙ্গাল ও একদা-ঘটি দর্শকরা দেখেন। দমদম এয়ার-পোর্টে সব নামী ও দামী ফুটবল দলের কর্মকর্তারা এবং কিছু খেলোয়াড় হাজির ছিলেন। মোহনবাগান

বা ইস্টবেঙ্গল থেকে কারো আসার প্রশ্নই ওঠে না। তবে তাদের সাপোর্টাররা যথারীতি হাজির হয়েছেন এবং যথারীতি সেই ট্র্যাডিশান বজায় রেখে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্ববিজয়ী দলের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিরাট মিছিল বেরোল। ভি আই পি রোডের দু' ধারে ব্যাণ্ড। বাজি পুড়ছে, মশাল জ্বলছে—চারদিকে আনন্দোৎসব। মিছিল ময়দানের সাতাশ তলা ফুটবল-ভবনের সামনে গিয়ে থামল। ম্যানেজার, কোচ, নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন হাত নেড়ে নেড়ে নিজের নিজের ঘরে চলে গেলেন। জনতা আবার জয়ধ্বনি দিল।

রাত দেড়টায় উগান্ বাটোর থেকে পরের ফ্লাইটে ষোলজন প্লেয়ার একে একে নামলেন। সন্ধ্যেবেলা সাজানো মঞ্চের পাশ দিয়ে তাঁরা যখন টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে এলেন, তিনটি সংবাদপত্রের এয়ার-পোর্ট করেসপণ্ডেন্ট ছাড়া আর কেউ নেই। একজন সাংবাদিক কী একটা প্রশ্ন করতে যেতেই একজন প্লেয়ার বললেন, 'দূর মশাই, এখন কিছু বলতে পারব না। বড্ড খিদে পেয়েছে। বরং একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন না।'

ওদিকে ফুটবল ভবনে তখনও বিজয়োৎসব চলছে। চারদিকে চিৎকার—'বজরংবলীজী কি জয়।'

॥ পাঁচ ॥

বাড়ি থেকে বেরোব বেরোব করছি, হঠাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং। টেলিফোনের তিন নং জেনারেল ম্যানেজারের ফোন। কী ব্যাপার? ব্যাপার কিছুই নয়, গতকাল একটা লাইন পেতে দেরি হয়েছিল। ওদের নতুন বসানো যন্ত্রগোয়েন্দার মারফৎ উনি জানতে পেরেই ক্ষমা চাইতে ফোনটা করেছেন। সম্প্রতি বাড়তি একজন

জেনারেল ম্যানেজারই নিযুক্ত হয়েছেন ওই জন্যে। কোন টেলিফোন গ্রাহকের কোন প্রকার অসুবিধা হলে তিনি নিজে ক্ষমা চান। তবে ইদানীং আমাদের কলকাতায় ফোন এত দক্ষ ও আধুনিব যে, গ্রাহকদের অসুবিধা হয় কদাচিৎ। তাই এই তিন নং জি এমের কাজ খুব দায়িত্বপূর্ণ হলেও বড় হালকা। সে যাই হোক, আমার হাতে আজ অনেকগুলো কাজ। ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে যাব; রেলেও একটা টিকিট কাটা দরকার। নাগপুর যাব। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে ফোন করে রেখেছিলাম। ন'টা সাতান্ন মিনিটে ট্যাক্সি হাজির। কাছেই ব্যাঙ্ক। ঠিক দশটায় পৌঁছতেই দেখি একটি চেয়ারও খালি নেই। মাথা গুঁজে সবাই কাজ করে চলেছেন। হল ঘরে ঢোকার মুখেই ছাপানো বিজ্ঞপ্তি: কাজের সময় পাড়ার থিয়েটার, পিসতুতো ভাইয়ের জ্বর, ইস্টবেঙ্গল-মোহন-বাগান, কাটা পোনার দর ইত্যাদি কোন বিষয়ে আলোচনা চলিবে না। কান চুলকোনো, পেনসিলে ধার দেওয়া, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দিবানিদ্রা, কোন সহকর্মীর গোপন প্রণয় নিয়ে ফিসফিস আলোচনা ইত্যাদি নিষেধ। পাবলিককে যেন এক মিনিট'ও অপেক্ষা করিতে না হয়। এক মিনিট দেরিতে আসিলে খাতায় সই করিবেন না। ধন্যবাদ।

ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা তোলার ছিল। সিগনোগ্রাফে সইটা এক সেকেণ্ডে মিলিয়ে নিয়ে একজন ক্লার্ক তিন মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় টাকাটা দিয়ে দিলেন। বেরিয়ে আসার সময় ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনি একটু আগে মনোযোগ দিয়ে যে বিজ্ঞপ্তিটি পড়ছিলেন, সেটি কিন্তু অনেক পুরোনো। আজকাল ওই বিজ্ঞপ্তিরও দরকার নেই। কার কী দায়িত্ব কর্মীরা সবাই ষোল আনা পালেন।

ব্যাঙ্ক থেকে পোস্ট অফিস। একটা ডেস্কে খাম পোস্টকার্ড

সাজানো। পাশের বাক্সে পয়সা ফেলে চারটে খাম, সাতটা পোস্টকার্ড নিলাম। এখানেও যন্ত্রের মত কাজ চলছে। খদ্দের আসা মাত্র কর্মীরা হাত বাড়িয়ে চটপট কাজ করে দিচ্ছেন। কাউন্টারের সামনে চল্লিশ মিনিট দাঁড়ানোর পর কী-চাই বলে মুখঝামটা দেবার কথা ভাবাই যায় না। শুনেছি নেপালে বাংলা-দেশে নাকি এখনও খদ্দেরকে মুখঝামটা দেওয়ার প্রথা আছে। আশ্চর্য। ডিব্রুগড়ের কাছে জয়পুরে আমার পিসতুতো দাদাকে কিছু টাকা মনিঅর্ডার করলাম। এখন মনিঅর্ডারের ব্যাপারে কোন ঝামেলা নেই। ছোট্ট একটা ফরম ভর্তি করে দিলেই হল। রসিদ-টসিদের বালাই নেই। টাকা তো ঠিকানায় পৌঁছবেই, রসিদে লেখালেখি করে অনর্থক সময় নষ্ট। কোন রেজিস্টার্ড পার্সেল বা ইনসিওর করলেও রসিদ লাগে না। পোস্ট অফিস থেকে বেরোবার মুখে একজন অফিসার এক গাল হেসে বললেন, কোন অসুবিধে হয় নি তো?

সব পোস্ট অফিসেই এই রকম করে একজন থ্যাংকইউ—অফিসার মোতায়েন আছেন।

দশটা নাগাদ বেরিয়েছি। এগারোটা চল্লিশ মিনিটের ট্রেন ধরতে হবে। ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিসের কাজ আধ ঘণ্টায় শেষ। তার মধ্যে চব্বিশ মিনিট লেগেছে যাতায়াতে। হাতে এখনও অনেক সময়। পথে পড়ল একটি দোকান। দোকানে চাল ডাল চিনি তেল দুধ ইত্যাদি প্যাকেটে সাজানো। নানা মাপের প্যাকেট। ওজনের বালাই নেই। পাঁচ কিলো চাল মানেই পাঁচ কিলো চাল। প্যাকেটের গায়ে দাম লেখা। শুনেছি, এই কিছু-দিন আগেও নাকি দোকানী-খদ্দের সম্পর্ক ছিল অবিশ্বাসের। খদ্দেরের সামনেই মাল ওজন করে দিতে হত। কে কাকে বেশী ঠকাতে পারে তাই নিয়ে জোর প্রতিযোগিতা চলত দোকানে-দোকানে, হাট-বাজারে। এই সব আজগুবি কথা শুনলেও হাসি পায়। কিছু চাল-ডাল কিনে দোকানীকে আমার ঠিকানাটা দিয়ে

ছিলাম। দোকানী বিগলিত বিনয়ে জানালেন, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে দেবেন।

দশটা চল্লিশ। হাতে অঢেল সময়। আমার একটা ইনসিওর ম্যাচিওর করেছে গতকাল। এল আই সি-র রিজিওন্যাল ম্যানেজার কাল দুপুরেই ফোন করে বললেন, মিস্টার চৌধুরী, গুড নিউজ। আপনার সি/কে ৯৭০০৩৫।৪৯০৬ নম্বরের ইনসিওরেন্সের টাকাটা রেডি। এই পাঁচ মিনিট আগে ম্যাচিওর করেছে। নিয়ে যান। ভেবেছিলাম নাগপুর থেকে ফিরে নেব। হাতে একটু সময় থাকাতে এল আই সি বিল্ডিংয়ে গেলাম। সামনের দিকটা ফাঁকা। কোন ঝাণ্ডা নেই, মাইক নেই, কাঠফাটা বক্তৃতা নেই, 'ম্যাচিওর' লেখা সাতান্ন নম্বর লিফটে নিরানব্বুই তলায় গেলাম। চেক রেডি। দুটি মাত্র সইয়ের দরকার। পলকে কাজ শেষ। 'ধন্যবাদ' বলতে না বলতেই এক কাপ কফি আর চিকেন স্যাণ্ডুইচ এসে হাজির। খেতেই হবে। কাস্টমারদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে এল আই সি এই সুন্দর প্রথা চালু করেছেন আজ বেশ কিছুদিন হল। আবার ধন্যবাদ। আবার লিফটে অধঃপতন।

সেই ট্যাক্সিতেই হাওড়া। কফি ইত্যাদি খেতে একটু দেরি হয়ে গেল। দশটা পঞ্চান্ন। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ থেকে সেকেণ্ড হুগলি ব্রিজ দিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে বারো মিনিট লাগল। নাগপুরের ট্রেন ছাড়তে আর তেত্রিশ মিনিট বাকী। হাতে ঢের সময়। ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। মোট সাতান্ন টাকা কুড়ি পয়সা মিটারে উঠেছে। ভাড়াটা চেকে ড্রাইভারকে দিয়ে দিলাম। নাগপুর কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন মহিলা 'ইয়েস' বলে এমনভাবে তাঁর সুন্দর সাদা নরম গলা বাড়ালেন, যেন রাজহাঁস। বললাম, ওয়েস্ট একসপ্রেসে নাগপুরের একটা টিকিট কেটেছিলাম গত পরশুর জন্যে। একটা জরুরী কাজে যাওয়া হয় নি। আজ সার্পেন্ট এক্সপ্রেসে ওই নাগপুরই যেতে চাই। সেকেণ্ডক্লাস থ্রি টায়ার স্লিপিং। এই সেই টিকিট। ভদ্রমহিলা কাগজ নিয়ে কী

একটা কাটাকুটির খেলা খেললেন, তারপর পুরোনো টিকিটটা ফেলে আজকের সার্পেণ্ট এক্সপ্রেসে নাগপুরের একখানা টিকিট দিয়ে দিলেন। সঙ্গে ট্রেনে পড়ার জন্যে একখানা বই। ফ্রি। বইয়ের নাম—'ট্রেনে চড়ার হাজার মজা।'

এগারোটা বাইশ। ট্রেন ছাড়তে আরও আঠারো মিনিট। স্টেশনের ফ্রি সিনেমা সেণ্টারে মিনিট পনেরো কী একটা বইয়ের খানিকটা দেখে ট্রেনে উঠলাম। এগারোটা উনচল্লিশ। ঠিক এক মিনিট বাদে ট্রেন ছাড়ল। সার্পেণ্ট এক্সপ্রেস কোথাও থামে না। সোজা নাগপুর।

॥ ছয় ॥

ভোর হয়-হয়। দমদমের আকাশ তখনও আবছা। একটি প্লেন এসে নামল। দিব্যকান্তি এক বৃদ্ধ নেমে এলেন। পিছনে ফাইল হাতে হাস্যমুখ এক যুবক। বৃদ্ধের পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, সাদা দাড়ি, ঘাড়ের উপর চুলের ঢেউ। আলখাল্লা আর চুল-দাড়ির ফাঁকে শরীর যেটুকু দেখা যাচ্ছে, যেন কাঁচা হলুদ। বৃদ্ধ

টার্মিন্যাল বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করতেই কাস্টমস ও এয়ারলাইনের কিছু লোক এগিয়ে এলেন। ওঁরা চেহারা দেখেই ধরে নিলেন, আমেরিকাপ্রবাসী কোন ভারতীয় সাধু। আজকাল সত্যি সত্যিই গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, যোগীদের যেতে হয় নিউইয়র্ক, শিকাগো লস এঞ্জেলেস। জ্যোতির্ময় ওই পুরুষকে দেখলে আপনাতেই মাথা নত হয়। দু'একজন হলেনও। উনি পা সরিয়ে নিলেন। অত্যুৎসাহী কয়েকজন তবু ছুটলেন পিছন পিছন। একজন বললেন, 'স্যার, একটু পায়ের ধুলো দিন স্যার।' আর একজন বললেন, 'একটা অটোগ্রাফ স্যার।' বৃদ্ধের মুখে বিরক্তি। বললেন, 'সেই কবে ১৯১৯ সালে ছার 'স্যার' খেতাব ছেড়েছি, তার ষাট বছর পরেও 'স্যার স্যার' করে জ্বালাতন! অনিল, বাইরে চল্।'

এতক্ষণে বোঝা গেল, উনি আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং সঙ্গী ভদ্রলোক তাঁর একান্ত সচিব অনিলকুমার চন্দ। তখনও সূর্যের আলো ভালো করে ফোটে নি। একটা ট্যাক্সি ডেকে দু'জনে বসলেন। অনিল চন্দমশাই বললেন, 'জোড়াসাঁকো।' ড্রাইভারটি বাঙালী, তাই তিনি আর একটু স্পষ্ট করে বললেন, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি চল।' ড্রাইভার ঠোঁটে বিড়ি চেপে এবং পায়ে ক্লাচ চেপে বললে, 'ঠাকুরবাড়ি-ফাড়ি জানি না মোসাই, ওখেনে ইউনি-ভার্সিটি না কী একটা যেন আছে। সেখানে খুব হাঙ্গামা-হুজ্জত হয় শুনেছি।' রবীন্দ্রনাথ কোলে হাত দুটি জড় করে চোখ বুঁজে বসেছিলেন। ড্রাইভারের কথায় চোখ খুলে একান্ত সচিবের দিকে তাকালেন। অনিল চন্দ বললেন, 'ওই ইউনিভার্সিটিতেই চল।'

অনেক গর্ত অনেক গরু অনেক জঞ্জাল ডিঙিয়ে ট্যাক্সি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ভিতরে ঢুকল। কত সুখের স্মৃতি, কত দুঃখের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সেই ১৯৪১ সালের ৮ আগস্ট এ বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তারপর এই প্রথম। কিন্তু এ কী! পাঁচ নম্বর বাড়িটা কোথায়

গেল? দ্বারকানাথের বৈঠকখানা, অবনীন্দ্রনাথের আবাস? বিচিত্রা-র পাশে কী কুৎসিৎ আর একটা বাড়ি! দেয়ালে দেয়ালে এসব কী লেখা? দাবি অভিযোগ, অমুককে তাড়াতে হবে, তমুককে রাখতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ভুরু কুঁচকে গেল। যেখানে জন্ম, যেখানে মৃত্যু সেই মহর্ষিভবনের দিকে তাকালেন। একটু রং, একটু মেরামতির চিহ্ন। মনে হল রবীন্দ্রনাথ একটু খুশি। কিন্তু খানিক বাদেই আবার বিরক্তি। মহর্ষিভবনের সামনে চুলদাড়িওলা একটা মূর্তি দেখে বললেন, 'অনিল, এই বাড়িতে কার্ল মার্কস বসালে কে?' অনিল চন্দ বললেন, 'না গুরুদেব, মার্কস নয়, আপনারই মূর্তি—সোভিয়েট রাশিয়ার উপহার।' রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'অনিল, জোড়াসাঁকো দেখা হয়ে গেছে, চল আমার শান্তিনিকেতনেই যাই।

আবার ট্যাক্সি। এবার হাওড়া। ফ্লাইওভারওলা হাওড়ার পুল দেখে রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগল। দানাপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়ার কথা পৌনে বারটা নাগাদ। ফার্স্ট ক্লাসের দুটো টিকিট কেটে দু'জনে কফি খেতে গেলেন রেস্তোরাঁয়। কিছু সময় হাতে আছে। কিন্তু ও হরি, বারটা গেল, তেরটা গেল, চোদ্দটা গেল, ট্রেন ছাড়ার কোন লক্ষণই নেই। অনিল চন্দমশাই অনেক ছোটাছুটি করলেন, অনেক লোককে ধরলেন, তবু জানা গেল না ট্রেন ছাড়তে এত দেরি কেন? যাই হোক, অবশেষে ট্রেন ছাড়ল বিকেল সাড়ে চারটায়। ততক্ষণে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ওয়েটিং রুমে বসে আঠারখানা চিঠি, তিনটি গান, ছ'টি কবিতা এবং দুটি প্রবন্ধ লিখে ফেলেছেন। খেয়ালই হয় নি এতক্ষণ রেল স্টেশনে বসেছিলেন। ট্রেনে উঠে আর এক দফা কষ্ট। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস কোন সীমারেখা নেই, টিকিট কেনা না কেনায় কোন পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথ ও অনিল চন্দ গুটিসুটি এক কোণে বসলেন। মাঝ স্টেশনে এক দঙ্গল ছেলে হৈ-হৈ করে

কামরায় ঢুকল। তার মধ্যে একজন অভদ্র ভঙ্গীতে বলল, 'ও দাদু, বেশ তো রবিঠাকুর—রবিঠাকুর চেহারা করেছ মাইরি, একটু সরে বোসো গুরু।' অবাক রবীন্দ্রনাথ ফিসফিস করে অনিল চন্দকে বললেন 'ওরা কোন্ ভাষায় কথা বলছে অনিল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারলেম না।'

সন্ধ্যের পর ট্রেন বোলপুরে পৌঁছল। রবীন্দ্রনাথের চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ। স্টেশনে নেমে গুণগুণ গান গাইতে থাকেন 'ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে, সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে।' একটা রিকশাতেই দুজনে শান্তিনিকেতনে রওনা হলেন। গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ নেই, পাকা রাস্তা।

নতুন নতুন বাড়ি। তা হোক, কালের বদলে কিছু অদল বদল তো হবেই। রবীন্দ্রনাথের মনে তার জন্যে তেমন ক্ষোভ নেই। সব বদলাক, কিন্তু প্রকৃতি তো বদলায় নি! আজকের এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা ঠিক এমনি আগেও ছিল, পরেও থাকবে। কিন্তু শালবীথি আম্রকুঞ্জ ছাতিমতলা এখনও আছে তো? থাকলে পূর্ণিমার আলোয় নিশ্চয়ই ঝলমল! আর সেই বাঁধভাঙা চাঁদের হাসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের গান 'ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা, আজি রইলে আড়ালে।' এই তো আমার শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ সুখের আবেশে তন্ময়। কিন্তু শান্তি-নিকেতনে গিয়ে উঠবেন কোথায়? গেস্ট হাউস? সেখানে জায়গা পাওয়া মুশকিল। বছর দুই আগে চিঠি লিখে ঘর 'বুক' না করলে পত্রপাঠ বিদায়। উত্তরায়ণের সব বাড়িই তো হয় অফিস নয় মিউজিয়াম। রথী নেই, বৌমা নেই, বুড়ি নেই, তাহলে কি পুপের বাড়িতে উঠব? নাকি দেহলিতে? সেখানে তো আবার ছোট বৌয়ের নামে মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা। এসব ভাবতে ভাবতে রিকশা এসে দেহলির কাছে বড় রাস্তায় দাঁড়াল। শাল-বীথির জ্যোৎস্নামাখা অপরূপ শোভা দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে।' দূর থেকে গানের সুর ভেসে এল।

রবীন্দ্রনাথ আরো খুশি। সুর আরো কাছে এল। রবীন্দ্রনাথ আঁতকে উঠলেন। এ কী কথা! এ কী সুর! একদল ছেলে-মেয়ের কণ্ঠে শালবীথি তখন গমগম করছে—'ও মুকন্দর কা সিকন্দর জানেমান হো।' রবীন্দ্রনাথ মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'অনিল, কলকাতা।' অনিল চন্দমশায়ের ইচ্ছে ছিল শান্তি-নিকেতন যখন ঘটনাচক্রে এলেনই, তখন তাঁর স্ত্রী রানী চন্দের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন। কিন্তু তা আর হল না। রবীন্দ্রনাথ এত বিরক্ত যে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা চলে না। অতএব সেই একই রিকশায় আবার বোলপুর। মশার কামড় খেয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটিয়ে সকালের ট্রেনে শিয়ালদা। আর জোড়াসাঁকো নয়, দুজনে উঠলেন একটা বড় হোটেলে।

স্নান-টান খাওয়া-দাওয়া সেরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'অনিল, জোড়াসাঁকো শান্তিনিকেতন দুটোই দেখা হয়ে গেল। তার চেয়ে বরং শিলাইদা যাই। ব্যবস্থা কর।' অনিল চন্দ বলেন, 'ব্যবস্থা করছি, কিন্তু কিছু দেরি হবে গুরুদেব। পাশপোর্ট লাগবে, ভিসা লাগবে। 'পাশপোর্ট?' 'ভিসা?'—রবীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে পড়েন। অনিল চন্দ জানান, শিলাইদা পাকিস্তান থুড়ি বাংলাদেশে। ভিন্ন রাষ্ট্র। যখন খুশি যাওয়া যায় না। অবসন্ন বিষণ্ন রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'অনিল, আর এখানে নয়। চল ফিরে যাই।'

॥ সাত ॥

সেই কবে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়েছিল, তারপর একশ সাতাশ বছর কেটে গিয়েছে। কত নেতার উত্থান-পতন, কত বিবাদ-বিসংবাদ। ইতিমধ্যে পঞ্চম মহাযুদ্ধের মত একটা বিরাট ঘটনা ভারতের ভূগোল ও রাজনীতির চেহারা পালটে দিয়েছে। বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বলে আলাদা কোন রাষ্ট্র

নেই, ভারত কনফেডারেশনের অন্তর্গত সবাই। একে তিন, তিনে এক। এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ঝণ্টু দে। বাঙালী প্রধানমন্ত্রী। অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়; তারপর পদোন্নতি। ঝণ্টু দে'র মত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী পৃথিবীতে আর নেই। ইতিহাসের পাতায় পড়েছি পণ্ডিত নেহরু নামে একজন প্রধানমন্ত্রী নাকি ওই রকম জনপ্রিয় ছিলেন। ঝণ্টু দে'র জনপ্রিয়তা অবশ্য যুব সমাজেই বেশী। তিনি দিল্লীর গদিতে দীর্ঘ দিন থাকার পরও ঠিক করতে পারছিলেন না, রাজনীতি চালিয়ে যাবেন, না খেলাধূলার জগতে ফিরে যাবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি ছিলেন মসকিউটো—ওয়েট চ্যাম্পিয়ন বক্সার। শেষমেষ খেলারই জয় হয়। তিনি গদি ছেড়ে দিয়ে আবার বক্সিংয়ের রিংয়ে ফিরে এসেছেন।

ঝণ্টু দে'র পর এখন প্রধানমন্ত্রী তেহবি গাড়োয়ালের দুরমুশ সিং ধুপধাপ। ধুপধাপজী পাহাড় অঞ্চলের লোক হলে কি হয়, বড় কাছাখোলা লোক। তাঁর শাসনকালে দেশের অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। স্ট্রাইক, লক আউট, ওয়ার্ক টু রুল, সিপাহি বিদ্রোহ ইত্যাদি ইত্যাদি। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। এক জোড়া উচ্ছের দাম বাহান্ন টাকা। নোট ছাপিয়ে ছাপিয়ে বই ছাপানোর কাগজে টান পড়েছে। তা ছাড়া দীর্ঘ দিন রাজ্য শাসন করে করেও আমরা ক্লান্ত। নেতাদের ভিতর বহু দিন থেকেই দাবি: ঢের হয়েছে, অনেক দিন তো স্বাধীনতা ভোগ করলাম, এবার ইংরেজদের হাতে আবার রাজদণ্ড তুলে দিলেই তো হয়। স্বাধীনতা যে এক প্রকার হীনতা, তা তো আমাদের বাঙালী কবি রঙ্গলাল বাঁড়ুজ্যে অনেক আগেই বলেছেন—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক বসল। বৈঠকের পর এয়ার-ফোর্সের একটা প্লেন পালাম থেকে ছুটে হীথরো বিমানবন্দরে গিয়ে

থামল। সেখান থেকে দিল্লীর দূত একটা খাম হাতে ছুটলেন ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে। ইংল্যাণ্ডে এখন প্রধানমন্ত্রী স্যার জিসকিষণ সিং। তিনি দিল্লীর প্রস্তাব শুনেই দশ গ্লাস লস্যি গলায় ঢেলে বললেন—মাথা খারাপ! আবার তোমাদের দেশে নাক গলিয়ে মরব নাকি? কোথায় পাব ক্লাইভ হেস্টিংস ডালহাউসিকে? নিজেরাই খেতে পাই না, শংকরাকে ডাক। ইমপসিবল। এ দেশের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না? নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। না আছে চাকরি-বাকরি, না আছে খাবার-দাবার। খাঁটি ইংরেজরা এত বছর শাসন করে দেশটাকে গোল্লায় দিয়েছে। আজ মাত্র সাত বছর হল আমরা প্রবাসী ভারতীয়রা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য শাসনের ভার নিয়েছি। সংখ্যায় আমরাই এখন বেশী, জাত সাহেবরা মাইনরিটি। প্রতিবারই আমাদের দল জিতছে। পালা করে একবার লুধিয়ানার লোক এবং একবার সিলেটের লোক প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে। আমার আগে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সুনামগঞ্জের শেখ খলিলুল্লা। তা যা বলছিলাম, ও সব হবে-টবে না বাপু। ভারতের মত এত বড় দেশ চালানোর কম্মো আমাদের নয়। থ্যাংক য়ু।

দিল্লীর দূত কিছু কেনাকাটা সেরে (লণ্ডনে অবশ্য আজকাল হেরিং মাছের শুঁটকি আর লিভারপুলের ভাঁপা দই ছাড়া ভাল বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না) সেই এয়ার-ফোর্সের প্লেনেই দেশে ফিরে এলেন। আবার এমার্জেন্সি ক্যাবিনেট মিটিং। তুরমুশ সিং ধুপধাপের মন খারাপ। ইউ কে রাজি হল না, ওদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বেশ আরামে থাকা যেত। আমেরিকা এবং রাশিয়া এত হীনবল যে, ওদের অনুরোধ করে লাভ নেই। দক্ষিণের এক বিরাট অঞ্চল নিয়ে মার্কিন দেশে নিগ্রোস্তান নামে আলাদা একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়েছে। দুই রাষ্ট্রে মারামারি কাটাকাটি লেগেই রয়েছে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর এবং নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার সেই

মহান মার্কিন ঐতিহ্য আর নেই। রাশিয়ার অবস্থাও অনেকটা তাই। একদিকে চীন এবং অন্যদিকে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে তাদের সীমান্ত যুদ্ধ চলছে বত্রিশ বছর ধরে। শান্তি-মৈত্রী-প্রগতির নাম করে দু-একটা জঙ্গী বিমান বা ট্যাংক পাঠানোর ফুরসত পর্যন্ত তাদের নেই।

সুতরাং দিল্লী নিরুপায়। তৃতীয় এমার্জেন্সি ক্যাবিনেট মিটিং চলল তিন দিন তিন রাত। দুরমুশ সিং ধুপধাপ পদত্যাগ করলেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী নন্দনন্দন হরিচন্দন পাণিগ্রাহী তাঁর জায়গায় এলেন। তিনি চতুর্থ এমার্জেন্সি ক্যাবিনেট মিটিং ডেকে নতুন প্রস্তাব দিলেন। অন্যের হাতে দেশ তুলে দেওয়া কাজের কথা নয়। ভারতের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী নেতারা নন, রাজধানী। ওই দিল্লীটাই অপয়া। লোদী তুঘলক খিলজি মোগলদের কবর এখানে। অমন যে রাজা যুধিষ্ঠির, তিনিও দিল্লী ছেড়ে হিমালয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। অর্থাৎ আধুনিক ভারতের দুর্দশার শুরু ১৯১১ সালে। কাজে কাজেই দিল্লী থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সাবেক রাজধানী কলকাতায় চল। আবার দুধ ও মধুর বন্যা হইবে।

যেমন কথা তেমন কাজ। ভারতের রাজধানী ফিরে এল আবার কলকাতায়। বাঙালীরা ময়দানে মিটিং ডেকে চিৎকার দিল —জয় পাণিগ্রাহীর জয়। বিজয়োৎসব চলল একুশ দিন ধরে। বাঙালীর ক্ষোভ ক্রোধ অভিমান ঘুচল। আবার হাজারে হাজারে কেরানির চাকরি, হাজারে হাজারে পারমিট লাইসেন্স। গঙ্গার দু' পারে নতুন নতুন কারখানা নতুন সেক্রেটারিয়েট রাস্তাঘাট ফোয়ারা বাগান হোটেল এলাহি ব্যাপার। বল বল বল সবে, শতবীণা বেণু রবে, বাংলা আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু, ঝণ্টু দে যা পারেন নি, পাণিগ্রাহী মশাই অনায়াসে তা করে দিলেন। কেন্দ্র আর চক্রান্ত করতে পারবে না, কেন্দ্র আর বিমাতৃসুলভ মনোভাব দেখাতে পারবে না। নন্দনন্দন হরিচন্দন জিন্দাবাদ।

গাড়ির পর গাড়ি। মালের পর মাল। পুরো সাত মাস আটাশ দিন লাগল দিল্লী থেকে কলকাতা ফাইল আর টেবিল চেয়ার আনতে। ফাইলের সঙ্গে এলেন কয়েক হাজার মাদ্রাজী এবং কয়েক হাজার পাঞ্জাবী। তাঁদের পিছন পিছন আরো ষাট সত্তর হাজার ঠিকাদার চুকলিদার মোসাহেব মেমসাহেব। সেই সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। সব মিলিয়ে দশ বারো লাখ অবাঙালী হাজির হলেন জোব চারনকের শহর কলকাতায়। রাজভবন রাইটার্স নিউ সেক্রেটারিয়েট লালবাজার সব রাতারাতি বেদখল হয়ে গেল। সারা ময়দান জুড়ে পড়েছে তাঁবু। গঙ্গায় লঞ্চে নৌকোয় স্টীমারে সরকারী কর্মচারীদের পরিবার। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে নেওয়া হল কল্যাণীতে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্ন সার্থক। কলকাতার জমির দাম বাড়ল হু-হু করে। উত্তর কলকাতার মাড়োয়ারীদের এবং দক্ষিণ কলকাতার মাদ্রাজী গুজরাতী পাঞ্জাবীদের বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় যে কয় ঘর বাঙালী ছিলেন, তারা সবাই চড়া দামে নিজেদের জমি ও বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে গেলেন কাকদ্বীপ সিয়াখালা গোবরডাঙ্গা। এই মুহূর্তে দমদম থেকে বেহালা এবং সল্ট লেক থেকে গড়িয়া—একজনও বাঙ্গালী নেই। কল্যাণী এখন মোটামুটি সমৃদ্ধ শহর। সেখানে নতুন রাইটার্স, নতুন লালবাজার। কিন্তু হোক কলকাতা হাতছাড়া, হোক অবাঙালীর সংখ্যাধিক্য তবু কল্লোলিনী তিলোত্তমা এই শহর তো আবার দেশের রাজধানী। জয় বাংলা। জয় বাস্তুহারা বাঙালীর।

॥ আট ॥

অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কথা ঘোষণা করার পর ভারতের রাজনীতিতে নানারকম কাণ্ড ঘটে গেল। মোরারজিভাই শুধু রাজনীতি ছাড়েন নি, দেশও ছেড়েছেন। তিনি এখন আছেন ফিলাডেলফিয়ায়। সেখানে এক আশ্রম খুলে অটো ইউরিন থেরাপি শিক্ষা দিচ্ছেন। জগজীবন রাম এই প্রথম ভোটে দাঁড়ালেন না। তিনি এখন

নেহরু ইউনির্ভাসিটিতে ভিজিটিং প্রফেসারের পদ নিয়ে জিও-জিনিওলজি পড়াচ্ছেন। চবন ও চরণ মিলে নতুন একটি দল করেছেন, নাম জনতা (চ)। এই দলের সদস্যদের নামে বা পদবীতে 'চ' থাকা চাই। চন্দ্রশেখরও এই নতুন দলে আছেন। চরণ সিং দলের সভাপতি। তার কারণ, তাঁর নামের আগেও চৌধুরীর 'চ'। এই দল নির্বাচনে জেতার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। অটলবিহারী ফার্নাণ্ডেজ করুণানিধি আবদুল্লা এবং বহুগুণা মিলে যে অন্য দল গড়েছেন তার নাম '৭৭'। এই সাতাত্তর নামধারী দলটি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে বাইরে থেকে বহু বড় বড় নেতাকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছেন।

পরিবর্তনের বড় ধাক্কা অবশ্য লেগেছে ইন্দিরা কংগ্রেসে। দলটি ভাঙলো এক মাসে আরো তিনবার। দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্যে ইন্দিরা গান্ধীকেই অবশেষে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি নতুন যে দল করেছেন, তার নাম কংগ্রেস (দীর্ঘ-ঈ)। অর্থাৎ ঈষৎ কংগ্রেস। কংগ্রেস (হ্রস্ব-ই) নামে যে দল এখনও আছে, তার সভাপতি ঝুটা সিং এবং সেক্রেটারি গুণ্ডা রাও। সঞ্জয় গান্ধী একটি নতুন দল গড়েছেন। দলের নাম কংগ্রেস (পু)। অর্থাৎ পুত্র-কংগ্রেস। এই দলে যোগ দিয়েছেন কান্তিভাই দেশাই, সুরেশ কুমার তথাগত শতপথী প্রমুখ। তা ছাড়া সম্প্রতি সদস্য হয়েছেন মধ্যপ্রদেশের সকলেচার ও হরিয়ানার দেবীলালের দুই পুত্র। জ্যোতি বসুর ছেলে চন্দনকে দলে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ নেই। তা ছাড়া সঞ্জয় প্রমুখদের সঙ্গে হাত মেলানো অসম্ভব। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই দলটিই এখন মুখ্য। লোকসভার প্রত্যেকটি আসনে একমাত্র তাঁরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

দলটির বৈশিষ্ট্য হল বিখ্যাত নেতাদের পুত্র ছাড়াও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভাগিনেয়দেরও তাঁরা ঠাঁই দিয়েছেন। সেই সুবাদে বিড়লাবাড়ি ও গোয়েংকা-বাড়িতে কাজ করা জয়প্রকাশের কয়েকজন ভাইপো

ভাগনেও পুত্র-কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। দলের সভাপতি সঞ্জয় গান্ধী দাঁড়িয়েছেন বর্ধমানের কাটোয়া কেন্দ্রে। কান্তিভাই আর্মেথিতে এবং সুরেশকুমার চিকমাগালুরে। বয়সের বাধা তুলে দেওয়ায় অনেক নাবালক পুত্রও কংগ্রেস-পু প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। যেমন ফার্নাণ্ডেজের ছেলে এবং রাজীব গান্ধীর ছেলে। ভোটদাতাদের অভিমত হল, পাবলিকের টাকায় সংসদে যে-ছেলেখেলা হয়, তা ছোট ছোট ছেলেরা অনেক ভাল পারবে। হাতাহাতি মারামারিতেও ছোটরা বড়দের চেয়ে দক্ষ। অতএব লোকসভায় এদের পাঠানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

ইন্দিরা গান্ধী দাঁড়িয়েছেন সেই রায়বেরিলিতে। রাজনারায়ণ নিজে কোথাও দাঁড়ান নি। তিনি ইন্দিরার চীফ ইলেকশন ম্যানেজার। রাজনারায়ণের ভরসাতেই ইন্দিরা নির্বাচনী-বৈতরণী পার হওয়ার আশা রাখেন। গতবার নির্বাচনে ইন্দিরাকে হারিয়ে তিনি যে ঘোর পাপ করেছেন, তা রাজনারায়ণ এখন স্বীকার করেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ভোটযুদ্ধ থেকে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন, ইন্দিরার হয়ে জোর খাটছেন। ইন্দিরা প্রথমে রাজনারায়ণকে তাঁর চীফ ইলেকশন ম্যানেজার করতে রাজী হন নি। কিন্তু রাজনারায়ণ নয়াদিল্লীতে ইন্দিরার বাড়ির সামনে শীর্ষাসনে লাগাতার ১৭২ ঘণ্টা হত্যা দেওয়ায় ইন্দিরার মন নরম হয়। ইন্দিরা একবার মাত্র রায়বেরিলিতে গিয়েছেন। বাকী সময় ঘুরছেন অন্যান্য নির্বাচন কেন্দ্রে। তাঁর দল কংগ্রেসের (দীর্ঘ-ঈ) প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস (হ্রস্ব-ই) নয়, কংগ্রেস (পু)। রায়বেরিলিতে প্রথম জনসভায় ইন্দিরা রাজনারায়ণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, রাজনারায়ণের জীবনে ও মননে যে দুই মনীষীর যুগলমিলন ঘটেছে, তাঁরা হলেন রাজকাপুর ও জয়প্রকাশ-নারায়ণ। সেই কারণে তাঁর নামও রাজ-নারায়ণ। এলাহাবাদ হাইকোর্টে এবং গত নির্বাচনে তিনি আমাকে গো-হারা হারিয়েছেন। গো-মাতার এই একনিষ্ঠ সেবককে আমার নির্বাচন পরিচালনার ভার দিয়ে আমি ধন্য।

ইন্দিরার কথায় ভোটদাতারাও ধন্য ধন্য করতে লাগল। রাজনারায়ণ বক্তৃতা মঞ্চে বসে তখন মুচকি মুচকি হাসছেন। তাঁকে দেখে চেনার উপায় নেই। অনেক রোগা হয়ে গেছেন। ভুঁড়ি নেই, সবুজ ফেট্টি নেই, কদমছাঁট চুল নেই। গুরু পাঞ্জাবি ও ফুলপ্যান্ট পরা। ঘাড় ঢাকা লম্বা চুল ও সুন্দর ঝোলানো গোঁফে তাঁকে দারুণ দেখাচ্ছে। ইন্দিরার বক্তৃতা শেষ হতেই তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন: রায়বেরিলির ভোটারগণ, হে নিমক-হারামের দল, ১৯৭৭ সালের চুনাওয়ে ইন্দিরাজীকে হারিয়ে তোমরা যে বদনাম করিয়েছিলে, এবার সেই বদনাম ঘোচাও। এত বছর ধরে ইন্দিরাজী তোমাদের জন্যে এত সব করলেন, আর তোমরা বেতমিজ বেইমানরা কিনা আমাকে ভোট দিলে। এমন আজীব ব্যাপার যেন এবার না হয়। পরমপ্রিয় ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস (পু) থেকে যিনি দাঁড়িয়েছেন, তার জামানত জব্দ করতে হবে। বল বল ইন্দিরামাঈ কী—। জনতা চিৎকার দিল—জয়।

কংগ্রেস (পু) দলের নেতা সঞ্জয় গান্ধী ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা দেশ। কান্তিভাই ভার নিয়েছেন পূর্ব ভারতের, তথাগত দক্ষিণ ভারতের, সুরেশকুমার পশ্চিম ভারতের। উত্তর ভারতের ভার রাজীবের ছেলে রাহুল গান্ধীর উপর। সঞ্জয় গান্ধী কংগ্রেস (হ্রস্ব-ই) এবং কংগ্রেস (দীর্ঘ-ঈ) দলকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে অনবরত বলে চলেছেন: এমার্জেন্সি শব্দটি তিনি ইংরেজী ডিক্সনারী থেকে তুলে দেবেন। হাসপাতালে এমার্জেন্সি নামে কোন ওয়ার্ড আর থাকবে না। সিনেমা হলে পর্যন্ত এমার্জেন্সি একজিট রাখা হবে না। তা ছাড়া তার দল যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে নাসবন্দীকে বাধ্যবন্দী করে রাখা হবে। অধিক সন্তান উৎপাদনের জন্যে দশ লক্ষ টাকার দশ হাজার গান্ধারী-পুরস্কার দেওয়া হবে। তিনি জানালেন, তাঁদের নতুন শ্লোগান হল—দশটি ছেলে কমসে কম, নইলে মেরে আলুর দম।

এই নতুন স্লোগান এত জনপ্রিয় হয়েছে যে, এখন দেশের সর্বত্র

মুখে মুখে ঘুরছে 'দশটি ছেলে কমসে কম।' নাগপুরে একটি সভায় সঞ্জয় এই নতুন স্লোগান দিতেই জনতার ভিতর থেকে একজন বলে উঠলেন—সব তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার তো মশাই একটিও ছেলে হল না অ্যাদ্দিনে? সঞ্জয় গান্ধী চটপট জবাব দিলেন, পাছে আমার স্ত্রী গান্ধারী-পুরস্কার পেয়ে যান সেইজন্যে। পেলে তো আপনারাই বলবেন নেপোটিজম। অতএব সুতরাং কাজে কাজেই কংগ্রেস (পু) কো ভোট দো, ভোট দো, ভোট দো।

ওদিকে কংগ্রেসের হ্রস্ব-ই এবং দীর্ঘ-ঈ নিজেদের মধ্যে এত কাদা ছোড়াছুড়ি করতে লাগলেন যে, জনতা (চ) তাদের প্রচারে জোর কদমে এগিয়ে গেলেন। জনতা (চ) হয়ে গেল কংগ্রেস পু-র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ঝুটা সিং এবং গুণ্ডা রাওয়ের দল তো তলিয়ে গেলই, ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত হিমসিম খেলেন। রাজনারায়ণ সামাল দিতে পারলেন না। ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পর দেখা গেল আবার কেলেঙ্কারি। কংগ্রেসের হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ এবং ৭৭ একটি আসনও পায় নি। অন্য সব আঞ্চলিক দলও তাই। দুটি মাত্র দল ভাগাভাগি করে নিয়েছে লোকসভার সব আসন। মোট ৫৪০টির মধ্যে জনতা (চ) ২৭০ এবং কংগ্রেস (পু) ২৭০। অর্থাৎ ড্র। অর্থাৎ আবার ইলেকশন। অর্থাৎ গৌরী সেনের টাকায় আবার ভোট ফর, ভোট ফর—।

॥ নয় ॥

পশ্চিমবঙ্গে এখন সবাই মৎস্যমন্ত্রী হতে চান। সেকালের মা-ঠাকুমারা বলতেন, 'দারোগা হও', একালের উচ্চাভিলাষী গুরুজনরা বলেন, 'মাছের মিনিস্টার হও।' এই আশীর্বাদটা অহেতুক নয়, এমন মজা আর কোন চাকরিতে নেই। মুখ্যমন্ত্রী এক নম্বর বটেন, কিন্তু এই উচ্চপদে এত ঝামেলা যে, মন্ত্রী

নির্বাচিত হবার পর সাধাসাধি করলেও কেউ তা হতে চান না; সবাই ধরাধরি করতে থাকেন মৎস্যমন্ত্রী পদটির জন্যে। তার কারণ অবশ্য অনেকগুলি। যিনি কৃষিমন্ত্রী তাঁকে ধান ফলাতে হয়, যিনি পূর্তমন্ত্রী তাঁকে রাস্তা বানাতে হয়, যিনি অর্থমন্ত্রী তাঁকে টাকা জোগাড় করতে হয়, অথচ মৎস্যমন্ত্রীকে এক কিলো মাছও ফলাতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় অন্য সব মন্ত্রীর সদর দপ্তর হলেও একমাত্র মৎস্যমন্ত্রীরই 'দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী।' তিনি বছরের সাড়ে এগারো মাস লণ্ডন হামবুর্গ নিউইয়র্ক সাংহাইয়ে কাটান। তৃতীয়তঃ মৎস্য উন্নয়ন বাজেট যা বরাদ্দ হয়ে থাকে, তার বারো আনাই মৎস্য-মন্ত্রীর সপরিবারে বিদেশে থাকা ও কেনাকাটা বাবদ খরচ করার বিধান রয়েছে।

মৎস্যমন্ত্রীর পক্ষে একটা বিরাট সুবিধে যে পশ্চিমবঙ্গে এক কিলো মাছও হয় না। খাল বিল পুকুর ভেড়ি ইত্যাদি সব শুকিয়ে গেছে। সেখানে উঠেছে নতুন নতুন বাড়ি। ভিন্ন রাজ্যের লোকদের হাতে কলকাতা বেদখল হয়ে যাওয়ার পর বঙ্গ-সন্তানরা ওই সব জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। পলি পড়ে পড়ে নদীগুলো আর নেই। ইতিমধ্যে বিহার উত্তরপ্রদেশ সমেত গোটা আর্যাবর্ত থেকে এক ফোটা জলও গঙ্গা নদী বেয়ে নীচের দিকে নামে না। অজয় ময়ূরাক্ষী রূপনারায়ণ শিলাবতী ভাগীরথী হুগলি ইত্যাদি নদী অনেকদিন আগেই মরে গেছে। কলকাতার বন্দর আর নেই। শ্রমিক বিরোধ বাড়তে বাড়তে হলদিয়াতেও তালা ঝুলছে। পশ্চিমবঙ্গের মাল আসা-যাওয়া করে ওড়িশার পারাদ্বীপ দিয়ে—ওটাই পূর্ব ভারতের একমাত্র বন্দর। এই সব নানা কারণেই ইদানীং টাটকা মাছের সঙ্গে বাঙালীর কোন সম্পর্ক নেই।

তবে তাই বলে কি বাঙালী মাছের স্বাদ ভুলে গেছে? মোটেই না। এবং সেই কারণেই একজন মহামূল্যবান মৎস্যমন্ত্রীকে

জনসাধারণের টাকায় পোষা হচ্ছে। মাছ বলতে বাঙালী এখন বোঝে গুঁড়োমতন একটা জিনিস—কৌটায় থাকে। এক এক গুঁড়োর এক-এক নাম। চেহারা দেখে নয়, গন্ধ শুঁকে তফাৎ বুঝতে হয়, বলতে হয় কোন্‌টা কই কোন্‌টা কাতলা। আজকাল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার সময় গুঁড়ো দ্য ইলিশ এবং গুঁড়িয়া চিংড়িয়ার ভীষণ কদর। এই সব ফিশ পাউডার তৈরি হয় বিদেশে। বড় ঘাটি বোস্টন ও হামবুর্গ। পশ্চিমবঙ্গে ফিশ পাউডার সাপ্লাই করে করে আমেরিকা আর জার্মানি লাল হয়ে গেল। এই বাবদ যে ডলার মার্ক আসে, তাই দিয়ে ওই দুটি দেশ পেট্রোল কিনছে হাজার হাজার ব্যারেল। ওদেশে আগে যেমন কোন কোন ব্যবসাদারকে বলা হত অয়েল কিং স্টীল কিং, এখন বলা হয় ফিশ কিং। প্রথম প্রথম আসল মাছ দিয়েই ফিশ পাউডার তৈরি করা হত। কিন্তু হেরিং স্যামন ট্রাউট বাঙালী জিবে পাত্তা না পাওয়ায় সিনথেটিক পাউডার তৈরি করা হচ্ছে বিস্তর গবেষণার পর। রুই কাতলা কই মাগুর চিংড়ি ইলিশ তো আছেই, সম্প্রতি মৌরলা তপসে ভেটকি এবং বাটা মাছের সিনথেটিক পাউডারও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। জাহাজ বোঝাই হয়ে প্রতি সপ্তাহে এগুলি আসছে পারাদ্বীপে। সেখান থেকে প্লেনে দমদম। বাঙালীর বাড়িতে এখন মাছের অভাব আর নেই।

এই পাউডারের নো-হাউ জানার জন্যে একটা ডেলিগেশন গিয়েছিল হামবুর্গে। আমাদের মৎস্যমন্ত্রী রোহিতাশ্ব গুঁই তখন ছিলেন বোস্টন। তিনি হামবুর্গ চলে এসে দলের নেতৃত্ব দেন। গুঁইমশাই কলকাতাতে রিপোর্ট পাঠালেন, ক্লাইমেটিক কণ্ডিশনের জন্যে ভারতের কোথাও এই পাউডার বানানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই নো-হাউ ওদের ট্রেড সিক্রেটও বটে। সরকার রিপোর্টটি মেনে নিলেন এবং মাননীয় মন্ত্রীমশাই যথাপূর্ব ইউরোপে-আমেরিকায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। স্বদেশবাসীর হিতকামনায় তাঁর

এই সব খন দেশত্যাগ শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই স্মরণ করে। অন্য কোন সচিব দিয়ে ফিশ পাউডার চালানের তদারকি কি করা যেত না? হয়ত যেত, কিন্তু মৎস্যমন্ত্রী বলেছেন, অন্য মন্ত্রীদের মত সচিবদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার পাত্র তিনি নন। তাই বাংলার মাটি বাংলার জলের মায়া ছেড়ে বিদেশ বিভূঁয়ে সস্ত্রীক ও সপুত্রক থেকে গোটা ব্যাপারটা তিনি তত্ত্বাবধান করছেন। এইভাবে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে দেশসেবা করতেই তিনি ভালোবাসেন। নইলে কে আর লণ্ডন নিউইয়র্ক হামবুর্গ বোস্টনের মত পচা শহরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়।

দু' চারটি খবরের কাগজ মৎসমন্ত্রীর বিদেশবাস নিয়ে চুটকি খবর ছেড়েছিল। সরকার ওগুলোকে তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে হাতমেলানো প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, যদি এই ধরনের অপপ্রচার চলতে থাকে, তাহলে কিছু সাংবাদিককে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণ-ধোলাই দেওয়া হবে। সরকারী প্রেসনোটে আরো বলে দেওয়া হয়, জনগণ যেন সংবাদপত্রের মিথ্যা ভাষণে বিভ্রান্ত না হন। বরং ঘরে ঘরে মাছের স্বাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্যে মৎস্যভুক বাঙালীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। খাল বিল ভেড়ি বুঁজিয়ে দিয়ে বাড়ি বানানোর বাড়তি জায়গা বের করার কৃতিত্ব যেমন শুধু সরকারের, তেমনি কৃতিত্ব এইভাবে ঘরে ঘরে মাছের স্বাদ পৌঁছে দেওয়ারও। যে সব সংবাদপত্র বলছে, এই হল দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো, তারা দেশের শত্রু জনগণের শত্রু মাছের শত্রু। এদের ডান হাত পুড়িয়ে দিতে হবে, এদের বাম হাত গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

বঙ্গবাসী সকলেই সরকারের সঙ্গে একমত। একালের, মানে এক/বিংশ শতাব্দীর বাঙালীরা বহুদিন হল মাছের চেহারা কী রকম ভাল করে জানে না। আগেকার তিন-চারটি সরকার ট্রলারে সাগর থেকে মাছ ধরে এনে খাওয়াচ্ছিলেন, কিন্তু ট্রলার-

গুলো অকেজো পড়ে থাকার পর আজ সাতার বছর হল মাছ নিয়ে কেউ বিশেষ ভাবেন নি। প্রত্যেক সরকারেই মৎস্যমন্ত্রী নামে একজন ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কাজ ছিল শুধু পরিকল্পনা পেশ করা। সম্প্রতি নতুন মন্ত্রিসভা একজন ডায়নামিক মৎস্যমন্ত্রী নিযুক্ত করায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থে ও প্রেরণায় বিদেশে সিনথেটিক ফিশ পাউডার আবিষ্কার হওয়ায় আমাদের সমস্যা দূর হয়েছে।

বাঙালী ছেলেরা যখন পাঠ্যবইয়ে পড়ে ইলশেগুঁড়ির নাচন দেখে নাচছে ইলিশ মাছ কিংবা গলদা চিংড়ি তিংড়িমিংড়ি, তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, জিজ্ঞাসা করে ইলিশ মানে তো গুঁড়ো মতন একটা জিনিস, সেটা আবার নাচে কী করে? মাস্টারমশাইরা ভাল উত্তর না দিতে পেরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যান জাদুঘরে। সেখানে একটা বিরাট বিভাগে ইলিশ রুই কাতলা ইত্যাদির ফসিল সাজানো আছে। নানারকম মাছের অদ্ভুত চেহারা দেখে ছেলেমেয়েরা হাসে। কেউ কেউ ভয়ও পায়—যেন খুদে টেরা/ডেকটিল দেখছে।

তবে একটি সমস্যা থেকেই গেছে। বাঙালী হেঁসেলে পাউডার দিয়ে নানারকম রান্না হলেও কিছু কিছু মহিলার মনে কিন্তু ইতিমধ্যে একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। তাঁদের বক্তব্য ফিশ পাউডারে মাছের স্বাদ পাওয়া যায় বটে এবং রান্নাও হয় উৎকৃষ্ট, কিন্তু মাছের মুড়ো চিবোনোর বাঙালী ঐতিহ্য যে গেল। যে সব বৃদ্ধা ঠাকুরমারা এখনও বেঁচে রয়েছেন, তাঁদের মুখেই মাছের মুড়োর স্বাদের কথা শুনেছেন একালের মহিলারা। এমন শব্দ স্পর্শ গন্ধময় খাদ্যদ্রব্য নাকি সহজে মেলে না। তাই এখন আক্ষেপ, হায় হায়, রসগোল্লা নেই, রবীন্দ্রনাথ নেই অবশেষে মাছের মুড়োও নেই। মহিলাদের চাপা বিক্ষোভ ক্রমেই প্রকাশ্য হল। ঘন ঘন সত্যাগ্রহ, অনশন, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি চলল। সরকার পড়লেন মুশকিলে। মৎস্যমন্ত্রীকে ডেকে আনা হল নিউইয়র্ক থেকে। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ফরেন একসপার্টদের জিজ্ঞেস করুন তো,

সিনথেটিক মাছের মুড়ো করা যায় কিনা। খাওয়ার সময় 'মড়াৎ' করে একটা ছুটো শব্দও যেন হয়। মৎস্যমন্ত্রী কোন কিছুতেই 'না' বলেন না। তিনি উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ স্যার, ব্যবস্থা করছি। আইসল্যাণ্ডের নোবেল লরিয়েট বিখ্যাত ফ্রেনেলিজিস্ট মিঃ ট্রাউটন ফিশারের সঙ্গে কথা বলব। তাঁর গবেষণার বিষয় মানুষ ও পশুপাখির মাথা। ভাল ফি পেলে মাছের মাথা নিয়েও তিনি মাথা ঘামাতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রীর গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে মৎস্যমন্ত্রী রোহিতাশ্ব গুঁই মিঃ ফিশারের সঙ্গে দেখা করলেন। কথাবার্তা পাকা হল: সিনথেটিক মাছের মুড়ো তিনি তৈরি করে দিলেনও। সেই স্বাদ, সেই আকার, কিন্তু আটকাল 'মড়াৎ' শব্দে। আর ওই শব্দ ছাড়া মাছের মুড়ো খাওয়ার কোন মানেই হয় না। ফিশার সাহেব যে শব্দ যোগ করেছেন, তা ঠিক 'মড়াৎ' নয়, অন্য রকম। অথচ মৎস্যমন্ত্রীর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ঐ 'মড়াৎ' শব্দটি চাই। 'সাউণ্ড' নিয়ে কাজ করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, এমন একজন জার্মান পদার্থবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ফিশার অবশেষে 'মড়াৎ শব্দের ব্যবস্থা করলেন। মৎস্যমন্ত্রী 'স্যাম্পল', নিয়ে এলেন, এবং ফিশ এডভাইসরি কমিটি তা অনুমোদনও করলেন। কমিটির একমাত্র মহিলা মেম্বার পুঁটিরাণী মিত্র সিনথেটিক মুড়ো চেখে বললেন, ডিলিসাস! মুখ্যমন্ত্রী ও মৎস্যমন্ত্রী কার্জন পার্কে গেলেন। সেখানে সত্যাগ্রহী মহিলারা কাজকর্ম ও কেনাকাটার ফাঁকে পালা করে আধঘণ্টা রীলে অনশন করছেন। তাঁদের কাছে সুসংবাদ দেওয়া মাত্র ধ্বনি উঠল: জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। মাছের মুড়ো জিন্দাবাদ। অতঃপর বাঙালী জাতি মাছ ভাত খেয়ে স্বদেশে সুখে শান্তিতে এবং একের পর এক মৎস্যমন্ত্রী বিদেশী মুদ্রা ধ্বংস করে বিদেশে বাস করতে লাগলেন।

॥ দশ ॥

অষ্টাদশ সাধারণ নির্বাচনের আড়াই বছর পর মন্ত্রিসভার হঠাৎ পতন হয়ে গেল। এই পতনের মূলে দুই নেতা ভুজুংলাল ও ভাজুংলালের লড়াই। ভুজুং-ভাজুং দিয়ে দেশের শাসন বেশ চলছিল বছর দুই। কারণ আগেকার প্রধানমন্ত্রী ভাঁড়ার ভর্তি খাবার আর আলমারি-ভর্তি টাকা রেখে গিয়েছিলেন। সেগুলি

ফুর্তিসে খরচ করে করে আর লম্বা লম্বা লেকচার মেরে বেশ চলছিল। হঠাৎ ক্ষমতা নিয়ে লাগল মারামারি। ভুজুংলাল পদত্যাগ করলেন। ভাজুংলাল প্রধানমন্ত্রী হলেন। ভাজুংলালজী দিল্লীর মসনদে বসেই ঘোষণা করলেন, তিনি সর্বপ্রথমে তাঁর প্রতিবেশী সমস্যার সমাধান করবেন। আগের প্রধানমন্ত্রী ভুজুংলালজী পাঁচ বছরে বেকার সমস্যা সমাধানের কথা বলতে বলতে নিজেই বেকার হয়ে গেছেন। ভাজুংলালজী কিন্তু ওদিকে না গিয়ে প্রতিবেশীদের কাছা ধরে টান দিলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা তার এই বক্তব্যের তাৎপর্য ধরতে না পেরে ভাবলেন এটিও একটি রুটিন-মন্তব্য। একজন সম্পূর্ণ স্বাধীন সাংবাদিক শুধু লিখলেন, প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে আমরাও একমত। তবে এই সমস্যা সমাধানের রন্ধ্রপথে স্বৈরশক্তি যেন প্রবেশ না করে।

কিছুদিন পরে টের পাওয়া গেল, প্রতিবেশী সমস্যার সমাধান বলতে মাননীয় ভাজুংলালজী কী বুঝিয়েছিলেন। সকলের অনুমান মিথ্যা, প্রধানমন্ত্রী মোটেই রুটিন-মন্তব্য করেন নি। এই প্রসঙ্গে আগে ভাগেই বলা প্রয়োজন যে, ভারত এখন সমরশক্তিতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। এটম বোমা হাইড্রোজেন বোমার আর কদর নেই। এগুলি কেউ আর বানায় না। পুরোনো যেগুলি ছিল মস্কো আর ওয়াশিংটনে—সব ফেলে দেওয়া হয়েছে আটলান্টিকে আর প্যাসিফিকে। ইতিমধ্যে ভারত সোলার এনার্জির সঙ্গে পটাসিয়াম সায়নাইড আর তুঁতে মিশিয়ে ভস্মলোচন নামে এমন এক মারণাস্ত্র তৈরি করেছে যার ভয়ে সব দেশ কাঁপে। ওই গুঁড়ো মতন বস্তুকে প্রতিহত করার শক্তি কারো নেই। আমাদের পরমপূজ্য ভাজুংলালজী প্রতিবেশী সমস্যা সমাধানে গান্ধীজির আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে গেলেন রাজঘাটে। তার কিছুদিন পরই সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে ওই মারণাস্ত্রটি প্রয়োগ করার হুমকি দিলেন আশেপাশের হীনবল রাজ্যগুলিকে। প্রথমপর্বে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আবার ভারতে ফিরিয়ে আনলেন। দ্বিতীয় পর্বে এল

শ্রীলঙ্কা ও নেপাল। তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত করতে কিঞ্চিৎ বেগ পেতে হয়েছিল, কিন্তু ভাজুংলালজীর বিশেষ দূত বজরংলালের নৈপুণ্যে তা-ও হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে। সেই পর্বে তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ ভারতের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত। প্রথম তিনটি পর্বের সাফল্যের পরিণামে চতুর্থ পর্বে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার কিছু কিছু অংশও ভারতের ভিতর চলে এল। এইভাবে প্রতিবেশী সমস্যা সমাধানের পর পঞ্চম পর্বে প্রতিবেশী না হয়েও ফিজি মরিসাস ত্রিনিদাদ গিয়ানা প্রভৃতি কিছু কিছু দূরের রাজ্য ভারতের অধীনতা স্বীকার করে নিল।

এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা যেমন বেড়ে গেল, তেমনি নতুন নতুন কিছু সমস্যাও দেখা দিল। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ভারতের মানচিত্র আঁকতে গিয়ে বার বার দিশেহারা হয়ে পড়ল। এত ঘন ঘন এলাকার পরিবর্তন হতে লাগল যে, ভূগোল বইয়ের একটি সংস্করণ শেষ হবার আগেই মানচিত্র পালটে যেতে লাগল। সবচেয়ে ঝামেলায় পড়ল স্মাগলাররা। যে সব প্রতিবেশী এলাকায় ওরা চোরাই মাল গোপনে চালান দিত, ওগুলি এখন দেশেরই মধ্যে। পরবর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চোরাই যোগাযোগ তখনও হয় নি। তা ছাড়া আগে কুয়ায়েত আবুধাবি দুবাইয়ের সঙ্গে বেশ স্মাগলিং চলত। কিন্তু আজ আঠারো বছর হল পশ্চিম এশিয়ার সব দেশে তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় শেখরা আবার গরিব হয়ে পড়েছে। চোরাই মাল কেনার পয়সা কোথায়? অল ইণ্ডিয়া স্মাগলার্স এসোসিয়েশনের আজীবন সভাপতি মিঃ ফেরেব্বাজীরাও চোরাদিয়া হুমকি দিয়ে বললেন, আমাদের স্মাগলিং বন্ধ করে দিয়ে সরকার যে পাপ করলেন, সে পাপের ক্ষমা নেই।

তারও চেয়ে বড় সমস্যায় পড়লেন সরকার নিজেই। প্রধানমন্ত্রী সংসদে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, প্রতিবেশী সমস্যার সমাধান তিনি করবেনই। কিন্তু একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র জয় করেন তো নতুন

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মদেশ জয় করলেন তো থাইল্যাণ্ড প্রতিবেশী হল। প্রতিবেশী থাইল্যাণ্ডকে জয় করলেন তো একে একে লাওস কাম্বোডিয়া ভিয়েতনাম চীন কোরিয়া জাপান প্রতিবেশী হল এবং ওই সব দেশ একে একে বিজিতও হতে লাগল। পূর্ব এশিয়ার মত পশ্চিম এশিয়ারও আফগানিস্তান পাকিস্তানের পর রাশিয়া ইরান থেকে শুরু করে সারা আফ্রিকা ও সারা ইওরোপের প্রতিটি রাজ্য যেই প্রতিবেশী হয়, ভাজুংলালজী সেগুলি ভারতের দখলে এনে সমস্যার সমাধান করেন। বছর তিন পর দেখা গেল এশিয়া আফ্রিকা ইওরোপের মত গোটা আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াও দিল্লির তাবে চলে এসেছে। নতুন রাষ্ট্রের নাম হল মহাভারত। এখন আর দেশে বেকার সমস্যা বলে কিছু নেই। অঢেল চাকরি। বরং লোকেরই টানাটানি। কেউ ম্যানিলায় এস-ডি-ও, কেউ লেনিনগ্রাডে মার্কেটিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। আমাদের ফরেন অ্যামবেসি-গুলো উঠে গেল। ওখানকার চাকুরেরা কেউ পঞ্চায়েৎ-কমিশনার, কেউ ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার হয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। বিশ্ব রাজনীতিতে দেখা দিল অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। সেই কবে ১৯৪০ সালে মার্কিন রাজনীতিবিদ ওয়েণ্ডেল উইলকি ওয়ান ওআর্ল্ডের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভাজুংলাল সেই স্বপ্ন সফল করলেন। ধন্য সেই মারণাস্ত্র ভস্মলোচন। ধন্য রাজচক্রবর্তী ভাজুংলাল।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে ভাজুংলাল যখন অতিশয় ব্যস্ত, এদিকে দেশের ভিতর আর একটি কাণ্ড হয়ে গেল। বিভিন্ন দলের কিছু কিছু পলিটিশিয়ান, স্বাধীন মতাবলম্বী বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী এবং কিছু গণতন্ত্রী ব্যবসাদার এককাট্টা হয়ে ভাজুংলালের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তাঁরা নানাভাবে নানা মাধ্যমে বাইরে বাইরে বলতে লাগলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রতিবেশী সমস্যা সমাধানের নামে অন্যের স্বাধীনতা হরণ করেছেন। তবে ভিতরে ভিতরে যে কারণে তাঁরা ক্ষিপ্ত, তার ব্যাখ্যা করলে মোটামুটি

দাঁড়ায় এইরকম : বিদেশ থেকে মোটা টাকা খাওয়া আমাদের ঐতিহ্য। বিদেশকে স্বদেশ বানিয়ে আমাদের পকেটে হাত দেবার তুমি কে হে। এখন সবটাই তো ভারতবর্ষ। ওসব চালাকি চলবে না। আমাদের সনাতন অধিকারে হস্তক্ষেপ করে স্বৈরতন্ত্রের পরিচয় দেওয়া অন্যায়। আমাদের কমজোরী ভেবো না ভাজুংলাল। তোমাকে দেখে নেব।

সত্যি সত্যিই ওঁরা দেখে নিলেন। ওদের সঙ্গে গোপনে হাত মেলালেন অল ইণ্ডিয়া স্মাগলার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ চোরাডিয়া। চারদিক থেকে এমন চাপ সৃষ্টি হল যে ভাজুংলাল সরকারের পতন ঘটল। নতুন সরকার প্রতিবেশী সমস্যার সমাধানে মাথা না ঘামিয়ে ভারতের মানচিত্রকে ঠিক আগের জায়গায় এনে দাঁড় করালেন। আবার আমেরিকা রাশিয়া চীন জারমানি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আবার বিদেশী টাকার খেলা চলতে লাগল। ভাজুংলাল রাজনীতি ছেড়ে বানপ্রস্থে গেলেন। সেখানে অনেকদিন আগে থেকেই আছেন ভুজুংলাল। এখন কোন একটি নিভৃত আশ্রমে বসে দুজনে একটি যুগ্ম-আত্মজীবনী লিখছেন। নাম নাকি দেওয়া হয়েছে 'ভুজুং-ভাজুং'। বইটি শীগগীরই বাজারে বেরোবে।

॥ এগার ॥

ভারতের মানচিত্র দেখলে বড় কষ্ট হয়। বিশেষ করে পূর্ব-ভারতের। অবশ্য পূর্ব-ভারত বলতে এখন বোঝায় শুধু বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ। মধ্যপ্রদেশের নাম পাল্টে হয়েছে পূর্বপ্রদেশ। তার কারণ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ওড়িশা, পশ্চিমবাংলা, আসাম ইত্যাদি রাজ্য জলের তলায়। বাংলাদেশও তাই। পূর্ব-

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এমন প্রবল ভূকম্পন তিন মাস ধরে চলতে থাকে যে, বিশাল জনপদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হিমালয় পর্বতটাই এখন অনেক বেঁটে ও নড়বড়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ো ধসে পড়ে দার্জিলিং-শিলিগুড়ি এলাকায় এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগর এখন পশ্চিমে হিমালয় ও পূবে তিব্বতের খাম্পা এলাকা দিয়ে বইছে। বঙ্গোপসাগরের নতুন নাম অবশ্য খাম্পা উপসাগর। আগে যেখানে সাংপো নদী ছিল, সেখানে দুর্দান্ত সী-বীচ। সুইমিং কস্টিউম পরা লামা-লামানীরা 'ওম্' ডাস ক্যাপিটেলে হুম' বলে রোজ সকালে সমুদ্রে সাঁতার কাটেন।

ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা ইত্যাদি নদী এবং নাগা মিশমি গারো ইত্যাদি পাহাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। পূর্ণিয়া থেকে ঘাটশিলা এখন আমাদের পূর্ব-সীমান্ত। বাঙালীর গর্ব কলকাতা, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন শান্তিনিকেতন, স্থাপত্যের তীর্থ কোনারক-ভুবনেশ্বর তো নেইই, ঢাকা, রাজশাহী, শিলং গৌহাটিও সাগরের অতলে। কাটিহারে দাঁড়িয়ে পাওয়ারফুল টেলিস্কোপে রেঙ্গুন এয়ারপোর্ট দেখা যায়। জামসেদপুর স্টীল টাউন সী-বীচ থেকে বেশি দূরে নয়। এখন পুরী বা দীঘার বদলে লোকেরা ডুমকা ও কিষণগঞ্জে সমুদ্র-স্নান করতে যায়। মনিহারিকে বলা হয় গঙ্গাসাগর। ওখানেই পশ্চিম ও উত্তর-ভারত থেকে লাখ-লাখ লোক সাগর-স্নান করতে আসেন। মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর হয়ে পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী এই মনিহারীর কাছেই সাগরে প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ ২৪-পরগণায় আগেকার সাগরদ্বীপের হদিস কারো পক্ষে দেওয়া আর সম্ভব নয়।

তবে তারই মধ্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আসামের কাছাড় জেলা এবং ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অংশ ভূমিকম্পের থাবা থেকে কোনক্রমে রেহাই পেয়ে শূন্যে ঝুলছে। বঙ্গভাষী অন্যান্য অঞ্চল আজ চিরবিলুপ্ত, থাকার মধ্যে আছে শুধু ওই এলাকাটি—যার নতুন নাম বাংলাদ্বীপ। নানা রকম টানা পোড়েনে ওই বঙ্গভাষী দ্বীপটি আন্দামান ও নিকোবর

দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। তবে ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও বাংলীদ্বীপ প্রশাসনে ভারতেরই অংশ। দূর থেকে দেখা যায় একটি বিন্দুর মত, কিন্তু ওই ছোট্ট দ্বীপই এখন বঙ্গভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একমাত্র কেন্দ্র। অতীতের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় এবং মূল ভূখণ্ড থেকে আজ কয়েক শ' বছর অসংলগ্ন থাকায় এই সংস্কৃতির চেহারা অবশ্য অন্য রকম। ওঙ্গি, জারোয়া, আন্দামানীজ সেন্টিনেলিজদের মত বাংলীজ জাতি। তবে জারোয়াদের মত বাংলীরা মোটেই হিংস্র নয়।

সেই ভয়ানক ভূমিকম্পের কথা একালের ছেলেমেয়েরা ভুলেই গেছে। পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লিতে যে-সব বাঙালী ছিলেন, তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। বাংলাভাষার চর্চা করে একমাত্র বাংলীজরা। তবে ওরা পুরানো বাংলা বইয়ের ভাষা তেমন ভাল বোঝে না। সেকালের ছাত্রদের কাছে চর্যাপদের ভাষা যেমন ছিল, একালের বাংলীজদের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্যও তেমনি। ত্রিপুরা ও কাছাড় অঞ্চলের কথ্য উপ-ভাষাতেই সৃষ্ট হচ্ছে নতুন বাংলা-সাহিত্য। বাংলীজরা কবিতা লিখতে আর গান গাইতে বড় ভালবাসে। আগে যাকে বলা হত রবীন্দ্রসংগীত, এখন তাকে ওরা বলে ভাটিয়ালি। সন্ধ্যাবেলা ওই ভাটিয়ালি গাইতে গাইতে ওরা নৌকোয় বেরিয়ে পড়ে কিংবা সুপারি গাছের তলায় বসে উদাস হয়ে দোতারায় ভাটিয়ালি সুর বাজায়। জাদুঘরে রাখা পুরানো বাংলা বইয়ে যে রকম পাওয়া যায়, তার থেকে কথা একটু আলাদা। সেদিন সোনামুড়ায় সাগরের জলধোয়া একটা পাথরের ঢিবিতে বসে একজন বাঙালী দোতারা বাজাতে বাজাতে গাইছিল, 'তুমরা শুনছ-নি, শুনছ-নি তার পায়ের আওয়াজ, ওই যে আইতাছে আইতাছে—'। হাইলা-কান্দি বলে বাংলী দ্বীপের এক মনোরম জায়গায় হুঁকো টানতে টানতে এক চাষী গাইছিল, 'ঘরর ভিৎরে ভমরা আইল গুণ-গুণাইয়া, আমারে কেটার কথা গ্যান হুনাইয়া।' ইদানীং এই সব গানের সঙ্গে 'বন্ধুরে' বলে একটা চিৎকার প্রায়ই জুড়ে দেওয়া হয়।

খোঁপায় ফুল গোঁজা একটি চিকন-কালো মেয়ে সেদিন ধর্মনগরের জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে কুড়োতে গাইছিল 'চিনলায় না আমারে নি, চিনলায় না বন্ধুরে—।' দিল্লির মহাফেজখানায় রাখা একমাত্র স্বরবিতানের সুরের সঙ্গে এই সব গানের সুরে অনেক তফাৎ।

বাংলী দ্বীপের লুপ্তপ্রায় বাঙালী অধিবাসীদের আচার-আচরণ খাওয়া-দাওয়া পোশাক-আশাক ইত্যাদি সরেজমিনে পরীক্ষা করার জন্যে এনথ্রোপলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া থেকে একদল বিশেষজ্ঞ ওই দ্বীপে গিয়েছিলেন। তাদের দেওয়া রিপোর্ট থেকেই জানা গেছে এরা নাকি ধানঘাসের বীচি থেকে শাদা মতন একটা জিনিস বের করে জলে ফুটিয়ে এখনও খায়। তার সঙ্গে মাছের আঁশটে ঝোল। ছেলেরা এবং মেয়েরা সেলাই ছাড়া লম্বা লম্বা থান এখনও পরে। ওগুলোকে বলা হয় ধুতি বা শাড়ি। ওদের ভাষা, বিশেষ করে শিলচর অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে জার্মান উচ্চারণের ভীষণ মিল। আগরতলা বাংলী দ্বীপের সদর দপ্তর। তবে করিমগঞ্জে স্থানান্তরের একটা গোপন চেষ্টা চলছে। অন্যরা অন্যায়ভাবে তাদের দাবিয়ে রেখেছে এই রকম একটা ক্ষোভ অনেকের মধ্যেই আছে। দিল্লির চক্রান্ত সম্পর্কে তারা নিঃসন্দেহ। তাদের লোকগাথায় বারবার বলা হয়েছে বাংলীজরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সেইজন্য তাঁরা গর্বিতও। আন্দামানীজ ও সেন্টিনেলীজদের তারা করুণার চক্ষে দেখে।

রিপোর্টের শেষদিকে কতকগুলি মন্তব্য ও সুপারিশ আছে। সেগুলি জানা যায় নি। তবে দিল্লির একটি সংবাদপত্র নির্ভরযোগ্য গুজবের ভিত্তিতে জানিয়েছেন যে, প্রচুর পরিমাণে ওঙ্গী ও আন্দামানীজদের বাংলী দ্বীপে বসিয়ে দিয়ে বাংলীজদের মাইনোরিটি করে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে। নইলে, বিশেষজ্ঞ-দলের বিশ্বাস, ওই বাংলী দ্বীপ সংঘবদ্ধ হয়ে দিল্লির কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে পারে। গান ও কবিতা ভালোবাসলে কী হয়, ওই বাংলীজরা নাকি বড় স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ। ওটা দমন করা দরকার।

॥ বার ॥

বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের পরিত্যক্ত এয়ার ফিল্ডে সেদিন সন্ধ্যায় যে আকাশযানটা নামল, তার আকার যেমন বৃহৎ, আওয়াজ তেমনি অদ্ভুত। এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন সাইকেলে, শব্দ শুনে চিৎপটাং। খানিক বাদে সম্বিৎ ফিরতেই সাইকেল ফেলে দৌড়ালেন থানায়। থানা থেকে খবর গেল লালবাজার। লালবাজার থেকে

রেডিও টি-ভি নিউজ পেপার। আধ ঘণ্টার মধ্যে এক দঙ্গল লোক বেহালায় এসে হাজির। জার্নালিস্ট পুলিস এম্বুলেন্স দমকল সিভিল ডিফেন্স নোটারি পাবলিক জাস্টিস অব পীস। পুলিস গোটা এলাকা কর্ডন করে রেখেছে। রিপোর্টার ফটোগ্রাফাররা সেই কর্ডন ভাঙতে চাইছেন এবং 'দেখে নেব' 'চীফ মিনিস্টারকে বলে দেব' ইত্যাদি হুমকিতে পুলিসকে শাসাচ্ছেন। পুলিস তাতেও টলছে না।

ওদিকে আকাশযানটা তখনও গোঁ-গোঁ করছে। ছয়কোণা বিরাট জিনিস। উপরে লাল হলুদ দুটো বাতি জ্বলছে আর নিভছে। তা ছাড়া আকাশযানের শরীর থেকে এক ধরনের আলো ঝলসাচ্ছে, যা অনেকটা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো। ফলে পুলিস বা সাংবাদিক কেউই এগোতে পারছেন না। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে একদল স্পেশালিস্ট এসে হাজির, এয়ারফোর্সের প্লেনে দিল্লি থেকে আসছেন আর একদল এবং সায়ান্স কলেজ থেকে কয়েকজন স্পেস সায়ান্টিস্টকেও ডেকে আনা হয়েছে অকুস্থলে। সকলেরই প্রশ্ন, যন্ত্রটি এল কোত্থেকে? উদ্দেশ্যই বা কী? আকাশযানের বিদ্যুৎ ঝলকের দাবড়ানিতে ফটোগ্রাফারদের ফ্লাশ বাল্‌ব কাজ করছে না। ছবি তুলতে গেলেই অদ্ভুত এক আলো এসে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। রিপোর্টাররা উসখুস করছেন। আকাশযানের বর্ণনা, থানার ও-সির ইণ্টারভিউ, সেই সাইকেল আরোহীর অভিজ্ঞতা—সবই নেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আসল বস্তুটি সম্পর্কে কেউ কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় তাঁরা ফাঁপরে পড়েছেন। এই ছয়কোণা যন্ত্রটা নতুন কোন ষড়যন্ত্র-টন্ত্র নয় তো? হতেও পারে।

পুলিসের বড় কর্তারা ঝোপের মধ্যেই কনফারেন্সে বসে গেলেন। অত্যুৎসাহী একজন রিপোর্টার আড়ি পেতে ওই গোপন আলোচনা শুনতে গিয়ে মিষ্টি ধমক খেলেন। রিপোর্টার মনে মনে ঠিক করে নিলেন, তাঁর রিপোর্টে ওই পুলিস পুঙ্গবকে এক হাত নিয়ে নেবেন। ওদিকে রাত ও লোকজন একই সঙ্গে বাড়ছে।

রিপোর্টাররা পরদিনের কাগজে কী করে খবর ধরাবেন ভেবে আকুল। চারদিকে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। এমন সময়, কী আশ্চর্য, ওই আকাশযানের বিচ্ছিরি আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল, বিদ্যুৎ-ঝলকের শব্দ থেমে গেল, এবং আরো অবাক্ কাণ্ড, তলার দিক দিয়ে একটা বিরাট দরজা খুলে গেল। পুলিসের সুইসাইড স্কোয়াড আর একটু এগিয়ে যেতে না যেতেই অদ্ভুত পোশাক পরা একজন দরজা ঠেলে নেমে এলেন। পিছনে কিম্ভূতমূর্তি আর একজন। সবাই স্তম্ভিত, সবাই বিস্মিত। কয়েকজন তো মূর্চ্ছা গেলেন আকাশযানেরই মতো গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে করতে। ওদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল এম্বুলেন্সে।

আকাশযানের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল এবং আবার গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুরু হল। তারই মাঝখানে কিম্ভূত চেহারার ওই লোক বা বস্তুটি তাঁর সঙ্গীর পিছন পিছন সোজা চলে এলেন রিপোর্টার-ফটোগ্রাফারদের মাঝখানে। ওই কিম্ভূতদর্শনের গায়ে এনামেলের পোশাক, সামনে পেছনে একটি করে চোখ, বুকের মাঝখান দিয়ে বেরিয়েছে একটা হাত এবং নীচের দিকে তিন হাঁটুওলা লম্বা পা। রিপোর্টাররা কিছু জিজ্ঞেস করতে যেতেই পুলিস অফিসার মাঝখানে পড়ে বললেন, 'প্লীজ ডোণ্ট। আগে আমরা ইন্টেরোগেট করে নিই, তারপর—'।

রিপোর্টাররা বললেন, 'ইম্পসিবল। আপনাদের পাল্লায় পড়লে রাত কাবার হয়ে যাবে। আমরা খবর ধরাব কী করে! তা ছাড়া ফ্রিডম অব প্রেস বলে একটা বস্তু তো আছে। স্বৈরতন্ত্রের দিন শেষ, আমরা এখন যখন খুশি যা খুশি লিখতে পারি, পুলিসী জুলুম আর চলবে না।'

বিস্তর কথা কাটাকাটির পর ওই অদ্ভুত পোশাকের লোকটি তাঁর শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলে বললেন, 'নমস্কার।'

উপস্থিত সকলের মাথায় বজ্রাঘাত এবং সমবেত প্রশ্ন—'আপনি বাঙালী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গড়বেতায় বাড়ি। আপাততঃ মঙ্গল গ্রহ থেকে আসছি। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক ওই গ্রহেরই বাসিন্দা।'

রিপোর্টার ফটোগ্রাফার পুলিস জনতা যে-যার কাজকর্ম ভুলে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। গড়বেতার লোকটি তখনও বলে চলেছে—'আর বলবেন না মশাই, যাচ্ছেতাই কাণ্ড। সেদিন শ্রীহরিকোটায় উপগ্রহটি তো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আপনারাই কাগজে লিখেছেন। কিন্তু আসল খবরটি ছাপা হয় নি। উপগ্রহের উপরে ছিল একটা ক্যাপস্যুল। তার ভিতরে বসানো হয়েছিল আমাকে। ব্যাপারটা জানেন শুধু জনা-তিন সায়েন্টিস্ট। তা' যা বলছিলাম। উপগ্রহ তো নষ্ট হলই, কিন্তু আমাকে নিয়ে ক্যাপস্যুলটা বোঁ-বোঁ করে উঠে গেল উপরে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে যাবার পর খেয়াল হল এ কোথায় এলাম। বিদেশ বিভূঁয়ে মারা পড়ব নাকি? গড়বেতায় মা আছেন, ছোট ভাই আছে। ওদিকে ক্যাপস্যুল ছুটছে তো ছুটছেই, আমি চেঁচিয়ে গান গাইছি—বঙ্গ আমার জননী আমার ইত্যাদি। এমন সময় দেখি একটা আকাশযান মঙ্গলগ্রহ থেকে শুক্রগ্রহের দিকে যাচ্ছে। রুটিন ফ্লাইট। একটা জানালা খোলা ছিল। ক্যাপস্যুলটা আকাশযানের গায়ে গায়ে আসতেই সুড়ুৎ করে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়লাম 'হাই জ্যাক হাই জ্যাক' চিৎকার পেড়ে। আমার হাতের টয় পিস্তলটা পাইলটের মাথার কাছে লাগিয়ে বললাম, গড়বেতায় নিয়ে চল, নইলে খুলি ফাটবে।' পাইলটটা কী বুঝল জানি না, শুক্রগ্রহের রুট বদলে পৃথিবী গ্রহের দিকে স্টিয়ারিং ঘোরাল। লক্ষ্য গড়বেতা। কিন্তু হিসাবের গরমিল হওয়ায় গড়বেতার বদলে নেমে পড়েছি বেহালা। আমার এই সঙ্গীই সেই পাইলট। নাম মঙ্গলী উচ্চারণে দাঁড়ায় খ্‌খ্‌র্যাশ। ভাল বাংলা জানেন। এনি কোশ্চেন?'

রিপোর্টাররা উত্তেজনায় কাঁপছেন, উল্লাসে লিখে চলেছেন। আকাশবাণীর রিপোর্টার এবং আরো কয়েকজন এগোলেন।

প্রঃ—মিঃ খ্‌খ্‌র্যাশ, এই ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?'

উঃ—আমার আবার কী প্রতিক্রিয়া হবে। প্রশ্নটা বোকা বোকা।

প্রঃ—আপনার কেমন লাগছে?

উঃ—বললাম যে, বোকার মত প্রশ্ন করবেন না। কেমন লাগালাগির কী আছে?

প্রঃ—কলকাতায় কি আপনি এই প্রথম এলেন?

উঃ—আপনার কি ধারণা, আমি এখানে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করি। তবে হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের শহরে পদার্পণ করতে পেরে আমি আনন্দিত। বৃহৎ শহর মহৎ শহর।

প্রঃ—রবীন্দ্রনাথের নাম আপনি জানেন নাকি?

উঃ—জানি মানে? আবার বোকামি? রবীন্দ্রনাথ পড়েই তো আমার বাংলা শেখা।

প্রঃ—রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের শহর আপনার তাহলে ভালই লাগছে?

হঠাৎ মিঃ খ্‌খ্‌র্‌ব্যাশ অদ্ভুত একটা আওয়াজ করলেন। গড়বেতার বাঙালী হাই জ্যাকার বললেন, ভদ্রলোক রেগে গেছেন। আর উত্তর দেবেন না। মঙ্গলগ্রহের পাইলট গটমট করে তাঁর আকাশ-যানের দিকে এগোলেন। কিন্তু আচমকা কা যে হয়ে গেল, আকাশযানটা তার পাইলটকে ফেলেই বিদ্যুৎবেগে শূন্যে উড়ে গেল। মিঃ খ্‌খ্‌র্‌ব্যাশ বিড় বিড় করে কী যেন বললেন, আর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সামনের ও পেছনের চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। ওই সময় ফটোগ্রাফাররা তার আর একটা ছবি নিলেন। গড়বেতার বাঙালী তাঁকে জাপটে ধরলেন এবং ইশারায় পুলিসকে ডাকলেন। পুলিস এসে তাঁকে জীপে তুলে চিড়িয়াখানার পাশে বেলভেডিয়ারের এক বাড়িতে নিয়ে গেল। দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে রিপোর্টার-ফটোগ্রাফাররা চলে গেলেন যে যার অফিসে। ওই বাঙালী হাই জ্যাকার হাওড়ায় গিয়ে গড়বেতার ট্রেন ধরলেন।

মিঃ খ্‌খ্‌র‍্যাশ এখন আছেন বেলভেডিয়ারের সেই বাড়িতেই। অনবরত কাঁদছেন আর খিদে পেলেই খাচ্ছেন। পাঁউরুটি আর মার্মালেড। তাঁকে অষ্টপ্রহর পরীক্ষা করছেন বিজ্ঞানীরা। আপনারা যে কেউ তাঁকে দেখে আসতে পারেন। রোজ দুপুর দেড়টা থেকে আড়াইটা তিনি দর্শন দেন। দর্শনী মাথাপিছু এক টাকা। শিশু ও তপশীলিরা ফ্রি।

॥ তের ॥

তিন দিকপালের পর পর তিনটি থীসিস প্রকাশিত হওয়ার পরও রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে আগেকার সেই সংশয় থেকেই গেছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর এই কবি সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না, কিন্তু বছর সাত আগে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বীরভূমের একটি জায়গা খুঁড়ে কিছু ঘরবাড়ি সমেত মাইক্রোফিল্মের এক

অক্ষত ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছেন। সেই আবিষ্কারের ফলেই ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথ নামক এক লেখক সম্পর্কে অবহিত হল। আজ থেকে আড়াই শ বছর আগে অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি নানা রকম দুর্বিপাকে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সব বই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং বাংলা নামে আলাদা কোন ভাষা আর না থাকায় ওই ব্যক্তিটি সম্পর্কে কোন কিছু জানার কথাও ছিল না। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আবিষ্কারে এখন সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে, লোকে জানতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথ নামে একজন লেখক নাকি পূর্ব ভারতে ছিলেন।

কিন্তু সত্যিই কি ছিলেন? প্রথমে অনেকে সন্দেহ করেছিলেন যে, মাইক্রোফিল্ম করা ওই সব রচনা সম্ভবতঃ কবি চণ্ডীদাসের লেখা। কারণ চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নানুর অতি নিকটে। কিন্তু ভাষা ও গদ্য রচনা দেখে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেকটার জেনারেল মিঃ গভীরাপ্পা খননসুন্দরম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ওই সব রচনা চণ্ডীদাসের হতেই পারে না, বরং বিদ্যাপতির কিছু কিছু রচনা রবীন্দ্রনাথ নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি ভানু সিংহের পদাবলীর কীটদষ্ট কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করেন। মিঃ খননসুন্দরম জানান, ১৯৭১ সালে পশ্চিম বাংলায় নকশালী নামক এক শ্রেণীর লোকের ভয়ে রবীন্দ্রনাথের সব রচনা মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয়েছিল বলেই এত বছর পর দৈবক্রমে ওই সব অমূল্য রচনার সন্ধান মিলেছে। মাইক্রোফিল্মের বিশাল আধারটি এক সুরম্য অট্টালিকার গহ্বরে লুকোনো ছিল।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার পর টোকিও মস্কো শিকাগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গবেষণায় নেমেছেন। তাঁদের কয়েকজনের মতামত জানা গেছে। টোকিও'র ডক্টর গোতামারু হামাগুড়ির বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর নামে তিনজন ব্যক্তি ছিলেন। ১নং রবীন্দ্রনাথের নিবাস ছিল অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত কলকাতার চিৎপুরে। ২নং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচীন পদ্মা নদী এবং বর্তমানে যামুদরিয়া নদীর পারে শিলাইদা নামক গ্রামের বাসিন্দা। ৩নং রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে বিহার, প্রাচীনকালে বীরভূমের বোলপুর অঞ্চলের অধিবাসী। ডক্টর হামাগুড়ি রচনাশৈলী ও বক্তব্যের ভিন্নতার অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বেশিও হতে পারে, তবে অন্ততঃ তিনজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা ওই মাইক্রোফিল্মে সংরক্ষিত।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ ভ্লাদিমার প্যাঁচাকোভ ডঃ হামাগুড়ির বক্তব্য মোটামুটি সমর্থন করে বলেছেন, আসলে ওই তিনজন বড়ু রবীন্দ্রনাথ, দীন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজ রবীন্দ্রনাথ নামে পরিচিত ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একটি নতুন তথ্য দেন। এই তিনজনের বাইরে আর একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন, যিনি বিশ্বভারতী নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেখানে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে একজন ছাত্র অধ্যয়ন করতেন বলেও তিনি জানান। শান্তিনিকেতনের অধিবাসী বড়ু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে একই নামে একজন ছাত্র কী করে আসে, সেই সম্পর্কে গবেষণার আরো অবকাশ আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিকাগোর মিসেস মিলাংকোলি অন্য দুই গবেষকের সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন, আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে কোন লেখকই ছিলেন না। প্রাচীন বাঙালী জাতি সম্পর্কে ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ মাদমোয়াজেল চুমু যে গবেষণা করেছেন, তার উল্লেখ করে মিসেস মিলাংকোলি বলেছেন সেকালের বাঙালীরা ছিলেন সূর্য ঠাকুরের উপাসক। প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যিকই তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছদ্মনামে বই লিখতেন। এই রেওয়াজ চলেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি

অবধি। তা ছাড়া গল্প কবিতা নাটক গান উপন্যাস ইত্যাদি সমেত যে বিপুল রচনাবলী পাওয়া গিয়েছে, তা তিনজন কেন, তিনশ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। তিনটি লোক যদি বসে বসে মাইক্রোফিল্মে পাওয়া লেখাগুলি কেবল কপি করে যায়, তাহলেও তার সারা জীবন কেটে যাবে। মিসেস মিলাংকোলি সেই সঙ্গে বলেন, মাইক্রোফিল্মের লেখাগুলি গোবিন্দ দাসের কড়চার মত জাল কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

তিন পণ্ডিতের জোর বিতর্কে বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে আলোড়ন চলছে। স্থির সিদ্ধান্তে কেউ এখনো পৌছননি। তবে নতুন একটা তথ্যে জানা গেছে, কোন একজন রবীন্দ্রনাথ নাকি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোকের পদবী অবশ্য ঠাকুর নয়. টেগোর। এই টেগোরের লেখা কিছু কিছু ইংরেজী রচনাও আছে। এতে বিতর্কটি আরো জট পাকিয়ে গেছে। তা ছাড়া পূর্ব ভারতের কিছু কিছু লোক প্রতি বছর মে মাসে "পঁচিশে বৈশাখ" নামে এক ধরনের পূজা করে। তাতে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়ে দাড়িওলা এক মুসলমান ফকিরের ছবি টাঙিয়ে ফুল উৎসর্গ করা হয়। সেই পূজার অন্যতম নৈবেদ্য এক ধরনের গান। সেই গান এমনিতে কেউ গায় না, কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের পূজোয় লাগে। গানের কথা ও সুর বড় একঘেয়ে। অনেকটা সত্যপীরের পাঁচালির মত। দুর্গোৎসবের পর পঁচিশে বৈশাখই এখন পূর্ব ভারতে বড় পূজো।

এই ফকিরের পূজো কেন হয় এবং এই ফকিরই বা কে, এখনও সঠিক জানা যায় নি, তবে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আড়াইপোঁচ হালাল বিভিন্ন কাগজপত্র ঘেঁটে সিদ্ধান্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে যদি সত্যি সত্যি কেউ থাকেন, তাহলে তিনি এবং ওই মুসলমান ফকির ভিন্ন ব্যক্তি এবং হিন্দুরা প্রতি বছর মে মাসে যার পূজো করে তাঁর আসল

নাম লালন ফকির। সত্যপীরের মতই তিনি হিন্দুধর্মে স্থান পেয়ে গেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ' নামটি ব্যবহার করে হিন্দুরা মুসলমানত্ব চাপা দিতে চায়।

অর্থাৎ এইভাবে গবেষণা চালাতে চালাতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, রবীন্দ্রনাথ নামে সত্যি সত্যি কেউ ছিলেন না। সম্প্রতি লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে রাবীন্দ্রিস্কি ঠাকুরোভ নামে একজন লেখকের কিছু বই পাওয়া গেছে। ওই নবাবিষ্কৃত মাইক্রোফিল্মের কিছু কিছু রচনা সেই রুশ লেখক ঠাকুরোভের লেখার অনুবাদ কিনা, ইতিমধ্যে সেই সম্পর্কে নতুন গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। সেই গবেষণার রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নি।

॥ চৌদ্দ ॥

মাননীয় বন্ধুগণ, আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। শতাধিক বছর যাবৎ পৌরসভার কোন নির্বাচন না হওয়ায় যে-কাজ মেয়রের করার কথা ছিল, পৌরমন্ত্রী হিসাবে আমি তাই করছি। সত্যি কথা বলতে গেলে পাতাল রেলের ইতিহাস গত একশ বছরের কলকাতার ইতিহাস। কত সরকার

এল, কত সরকার গেল কত মহাপুরুষের উত্থান ও পতন, কিন্তু পাতাল রেলের কাজ অবিশ্রান্ত অবিরাম গতিতে এগিয়েই চলেছে। সেই কবে ১৯৭২ সালে ইন্দিরা গান্ধী নাম্নী জনৈকা প্রধানমন্ত্রী পাতাল রেলের এবং হাওড়া-আমতা রেলের শিলান্যাস করেছিলেন সাড়ম্বরে, তারপর যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত, হাওড়া-আমতা রেলের কাজেই হাত পড়ে নি, কিন্তু পাতাল রেল প্রবল বিক্রমে কলকাতার বক্ষ বিদীর্ণ করেছে গত এক শতাব্দীকাল ধরে। পাতাল রেল বাঙালীর ঐতিহ্য, পাতাল রেল বাঙালীর গর্ব। (তুমুল হর্ষধ্বনি)। বাঙালী নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, বাঙালী ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছে, বাঙালী নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার রেকর্ড করেছে, বাঙালী হাত পা বেঁধে হেদোয় একশ' সাতাশ ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে, কিন্তু কলকাতার পাতাল রেল সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে এশিয়ার মুখ উজ্জ্বল করেছে। পৃথিবীর আর কোন প্রকল্প শেষ করতে এত দীর্ঘদিন লাগে নি। (আবার হর্ষধ্বনি)।

বন্ধুগণ, আপনারা এখনই সব উল্লাস খরচ করে ফেলবেন না। আমরা বাঙালীরা অল্পে সন্তুষ্ট নই। নাল্পে সুখমস্তি। আমাদের রেকর্ড আমরাই ভাঙব। ১৯৭২ সালে কাজ শুরু করে ২০৭২ সালে আমরা মাত্র টালিগঞ্জ থেকে চৌরঙ্গির কাজ শেষ করেছি। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, চৌরঙ্গি থেকে দমদম পর্যন্ত পাতাল রেলের কাজ সম্পূর্ণ করতে আমরা আরো অন্ততঃ একশ বছর নেব। (হাততালি)। আপনারা জানেন, মহাকালের বিচারে একশ' বছর দু'শ বছর কিছুই নয়। সময়ের জন্য হা হুতাশ না করে দীর্ঘসূত্রিতার নতুন আর একটি রেকর্ড যদি আমরা করতে পারি, তাহলে বাঙালী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে স্বীকৃত হবে। আজ সেই শুভদিন সমাগত।

বন্ধুগণ, প্রাচীন কলকাতা কোথায় গেল? বাগবাজার কুমারটুলি প্রভৃতি অঞ্চল নদীগর্ভে বিলীন, গঙ্গা নদী এখন চিৎপুর রোড দিয়ে বয়। আমরা ইতিহাসের বইয়ে পড়েছি সোনারপুর

বারুইপুর অঞ্চল নাকি একদা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, আজ সেখানে বিশাল বিশাল অট্টালিকা, সুরম্য প্রাসাদ, প্রশস্ত রাজপথ। শহরের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র ওইসব দক্ষিণাঞ্চলে। শোনা যায় ডালহৌসি নামক একটি অঞ্চলে নাকি সেকালে সব ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। সেই ডালহৌসি, সেই রাইটার্স, সেই ময়দান কোথায় গেল? গঙ্গা নদী রেড রোড পর্যন্ত ছুটে এসেছে। পাতাল রেলের জন্যে কাটা মাটিতে ময়দানে তৈরি হয়েছে বিরাট পাহাড়। সেই পাহাড়ে নানারকম জীবজন্তুর অবাধ বিচরণ। ডালহৌসি এলাকার মতো চৌরঙ্গি এলাকাও গৃহশূন্য। পাতাল রেলের কাজ শেষ হওয়ার আগে কলকাতার বিরাট অংশ পাতাল প্রবেশ করেছে। জঙ্গলে ছেয়ে গেছে সেকালের ক্যামাক স্ট্রীট, হ্যারিংটন স্ট্রীট। নদী পাহাড় বনে চমৎকার দৃশ্য চৌরঙ্গি ও ডালহৌসি এলাকার। আলিপুরের চিড়িয়াখানা আজ চৌরঙ্গির-ভিতরে। জনসাধারণের সুবিধার জন্যে সরকার সেখানে তৈরি করে দিয়েছেন দুটি ট্যুরিস্ট লজ, তিনটি ফরেস্ট বাংলো। গোসাবা থেকে চৌরঙ্গিতে সরিয়ে আনা হয়েছে টাইগার প্রজেক্টের সদর দপ্তর। বারুইপুর-সোনারপুর এলাকা থেকে নগরবাসীরা বাসে করে টালিগঞ্জ এলে সেখান থেকে পাতাল রেলে চড়ে চৌরঙ্গির অভয়ারণ্যে যেতে পারবেন। এমন সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়?

বন্ধুগণ, আপনারা পাতাল রেল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার সুযোগ দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি আমার বৃদ্ধ পিতার কাছে শুনেছি, তিনি নাকি তাঁর ঠাকুরদার কাছে শুনেছেন যে, পাতাল রেলের কাজ যখন শুরু হয় তখন কলকাতা শহর প্রধানত টালিগঞ্জ থেকে দমদম বিস্তৃত ছিল। সেই কারণেই ওই দুটি অঞ্চলকে যুক্ত করার জন্যেই পাতাল রেলের সৃষ্টি। ইতিমধ্যে ভবানীপুর চৌরঙ্গি বৌবাজার ইত্যাদি অঞ্চলের ঘরবাড়ি পরিচর্যার অভাবে ভূমিসাৎ হয়ে যাওয়ায় এবং ধীরে ধীরে ঘন বনে গোটা মধ্য কলকাতা আবৃত হয়ে যাওয়ায় ডালহাউসি-চৌরঙ্গিতে

পাতাল রেল বসানোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ভেবে দেখুন, কর্তব্যে কী নিষ্ঠা, পূর্বসূরীদের প্রতি কী শ্রদ্ধা, ১৯৭২ সালের সেই ব্লুপ্রিন্ট পরিবর্তন করার কু-চিন্তা কেউ মনে আনেন নি এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টালিগঞ্জ থেকে চৌরঙ্গি—পাতাল রেলের সেই কাজ অবশেষে শেষ হয়েছে এবং দমদম থেকে চৌরঙ্গির কাজও পুরোদমে চলছে। তবে এই প্রসঙ্গে সানন্দে ঘোষণা করি, টালিগঞ্জ থেকে বারুইপুর নতুন পাতাল রেল বসানোর প্রস্তাব আমাদের ৫০তম পঞ্চবার্ষিক যোজনায় কার্যকর করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। (তুমুল হাততালি)। এই সিদ্ধান্তের পিছনে পৌরমন্ত্রী হিসাবে আমারও কিছু হাত আছে, একথা সবিনয়ে নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। (আরো হাততালি)।

যাই হোক, বন্ধুগণ, নিজের ঢাক নিজে না পিটিয়ে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমার পূর্ববর্তী বক্তা পাতাল রেলের ৮৭তম জেনারেল ম্যানেজার বিশদভাবে আপনাদের সব কিছু বুঝিয়েছেন। আমি শুধু আর একটি কথা বলে বিদায় নিতে চাই। বারুইপুরের প্রশান্ত শূর এভিনিউয়ে দীর্ঘদিন বসে-পড়া হকারদের তাড়াতে এক্ষুণি আমায় যেতে হবে। মনে রাখবেন বন্ধুগণ, এই পাতাল রেল আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি। প্রথম কয়েক বছর কংক্রীটের চাঙড় ধুপধাপ ভেঙে পড়ে যদি কিছু কিছু দুর্ঘটনা হয়, তাতে হতাশ হবেন না। জাতীয় কর্তব্য হিসাবেই হাস্যমুখে বিপদকে বরণ করে নেবেন। ভুলে যাবেন না, পাতাল রেল তৈরীর যাবতীয় উপাদান স্বদেশে প্রস্তুত। এই স্বদেশী কর্মযজ্ঞের বলি হয়ে 'মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান।' বন্ধুগণ, আপনারা জয়ধ্বনি দিন। পাতাল রেলের কাজ যখন শুরু হয় সে যুগের একজন শ্রমিকের নাতির নাতি পাতালিয়া কুর্মী আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত। গত পাঁচ পুরুষ ধরে তারা পাতাল রেলে কাজ করছেন। পাতালিয়াজীই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি যিনি বোতাম টিপে প্রথম ট্রেনের জয়যাত্রা……।

[তারপরেই 'দুম'। ২০৭২ সালের ১৫ আগস্ট পাতাল রেলের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরমন্ত্রীর এই ভাষণ জাদুঘরের টেপ রেকর্ডারে ধরা আছে। অনুষ্ঠানের বহুদিন পর টেপ রেকর্ডার বাজানোর সময় বক্তৃতার শেষ দিকে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। মনে হয় যেন কংক্রীটের চাঙড় একের পর এক ভেঙে পড়ছে। সেই সঙ্গে শোনা যায় বহু লোকের গোঙানির আওয়াজ। পৌরমন্ত্রীর ভাষণ, বলাই বাহুল্য, শেষ হতে পারে নি। তাঁর শেষ বাক্যটি শেষ হবার আগেই সেই শব্দ 'দুম'। টেপ রেকর্ডারটি কী করে বাঁচল এখনও জানা যায় নি।]

॥ পনের ॥

নন্দাদেবীর চূড়োয় সি-আই-এ কী সব যন্ত্র বসিয়েছিল অনেক বছর আগে। তাই নিয়ে হৈ-চৈ হয়ে গেছে হিমালয় পাড়ায়। নন্দাদেবীর দেখাদেখি কৈলাসে কে-জি-বি পালটা একটা যন্ত্র বসাতে গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু পেটো আর পাইপগান নিয়ে নন্দীভৃঙ্গী এমন তেড়ে যায় যে, কে-জি-বি'র মেজ কর্তা মার্শাল স্পাইনোভ পালিয়ে

প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তারপর থেকেই কৈলাসে (রাজধানী দিল্লির কৈলাস নয়) কড়া পাহারা। ঢুকতে বেরোতে বডি সার্চ করা হয়, অচেনা কাউকে দেখলেই মিসায় আটক করা হয়। এবং বাঙ্কারের ব্যবস্থাও আছে চূড়ায় চূড়ায়। এমন কি কৈলাস পর্বতের ইজারাদার মহাদেবচন্দ্রের খাস তালুকেও কথাবার্তা গোপনে টেপ করে রাখা হয়। সেই টেপেরই কিছু অংশ হাত ফসকে গঙ্গোত্রীতে হঠাৎ পড়ে যায়। তারপর গঙ্গা নদী বরাবর নীচে নামতে নামতে গত পরশু কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে এসে ডাঙায় আটকা পড়ে। গোটা ক্যাসেট-ই কাদার তলায় পড়েছিল। গঙ্গাস্নান করতে এসে জল পুলিসের বড়বাবু তা কুড়িয়ে পান এবং তৎক্ষণাৎ লালবাজারে জমা দেন।

সেই ক্যাসেটের দৌলতে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যাদের ধারণা, কৈলাস আগেকার মত বরফ-ঠাণ্ডা, তাঁরা হালের খবর কিছুই রাখেন না। সেন্ট্রাল হিটিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে আজ কুড়ি-পঁচিশ বছর। মহাদেববাবুর চেহারাও আর ক্যালেণ্ডারের শিব ঠাকুরের মতো নয়। বাঘছাল নেই, ভুঁড়ি নেই, ছিমছাম ধোপদুরস্ত চেহারা। সেদিন সিল্কের একখানা লুঙ্গি আর গুরু পানজাবি পরে মহাদেব বসেছিলেন তাঁর ড্রয়িং-রুমে। উলটো দিকে একটা চেয়ারে বসে পার্বতী দেবী। বাইরে পাহারা দিচ্ছে নন্দীভৃঙ্গী। ছেলেমেয়েরা আলাদা আলাদা চূড়ায় থাকে। বিজয়া বা নববর্ষের সময় প্রণাম করতে আসে। সেদিন রাত্রে খেয়েও যায়।

মহাদেবকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে মশা। কৈলাসে ঠাণ্ডা তাড়ানোর পর মশারা তেড়ে এসেছে। তাদের জ্বালায় দু' দণ্ড শান্তিতে থাকা মুশকিল। পার্বতীর অনেক সুবিধে। দশ হাত থাকায় দু'হাতে সোয়েটার বোনেন, এক হাতে শিবের পিঠের ঘামাচি মারেন, আর এক হাতে মশা তাড়ান। বাকি হাতগুলি লাগে অন্য কাজে। মহাদেব খবরের কাগজে পূজা সংখ্যার বিজ্ঞাপনগুলো পড়ছিলেন। আর ক'দিন বাদেই তো যেতে হবে পশ্চিম বাংলায়। সূচীপত্র দেখে নিচ্ছেন কোন্‌টা কিনবেন, আর কোন্‌টা চেয়ে-চিন্তে এনে পড়বেন।

পার্বতী বললেন, 'সূচীপত্র আর দেখতে হবে না, সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। তার চেয়ে বরং ইলেকশনের কথা কিছু বল। এবার হয়েছে বিপদ। পূজোর পরটাতেই ভোট। প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে কেবল শুনতে হবে—মা, আমাকে জিতেয়ে দাও, মাগো, আমার দলকে জিতিয়ে দাও। আগে থাকতেই ঠিক করে যেতে হবে কোন্ দলকে এবার সাপোর্ট করব।

'ঠিক করাকরির কী আছে পারু, আমি তো—।' মহাদেবের কথা শেষ করার আগেই পার্বতী খেঁকিয়ে ওঠেন, 'ন্যাকামি রাখো। আমি কি দেবদাসের পার্বতী যে পারু-পারু করছ?'

'ও-ই হলো। আমার যদি পারু ডাকতে ইচ্ছে করে, তোমার তাতে কী? ইচ্ছে হলে তুমিও আমায় দেবদা বলতে পার'—মহাদেব নির্লিপ্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে আর এক বড়ি এল এস ডি মুখে পুরে দিলেন।

'ঈস, দেবদা, না মহাদেবদা? বয়ে গেছে আমার বেলেল্লাপনা করতে'—পার্বতী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন—'তার চেয়ে বরং ভোটের কথা বলছিলাম, জবাব দাও।'

মহাদেব নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি তো ঠিক করে ফেলেছি ইন্দিরাকেই সাপোর্ট দেব। ইন্দিরা মানে লক্ষ্মী। আমার মেয়ের নামে নাম।'

অগ্নিতে গৃতাহুতি পড়ল। পার্বতী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ভীমরতি ধরেছে দেখছি তোমার। এত সব অপকীর্তির পর ওকেই গদিতে বসাতে চাও? ছড়ি ঘোরানোর জন্যে ওর সঙ্গে আবার আছে ছেলেটা। ছেলেটাকে যদি দূর করে দিত তাহলেও না হয় বুঝতাম।'

'বলিহারি বুদ্ধি তোমার গিন্নি'—মহাদেব মুখ টিপে হেসে বলেন—'এখন বলছ ছেলেটাকে কেন সরিয়ে দিচ্ছে না। আর যদি সরিয়ে দেয়, তখন বলবে, দেখলে, কেমন ডাইনি। মা হয়ে ছেলেকে যে তাড়িয়ে দেয়, তার কাছে অন্যের ভরসা কী। আসলে তোমরা মেয়েরা মেয়েদের দেখতে পার না।'

পার্বতী চটে-মটে বলেন, 'ককখনো না, আমার কাছে মেয়েলি-পনা নেই। সুনীতি-কুনীতি মানি বলেই আমি ইন্দিরা কংগ্রেসকে সাপোর্ট করতে পারব না।'

মহাদেবের তখন ঝিম লেগেছে, ধীর ঠাণ্ডা গলায় জানতে চান তাহলে পার্বতী ভোটে কোন্ পক্ষ নেবেন। পার্বতী সোয়েটার বোনা থামিয়ে বলেন, 'আমি ঠিক করেছি, এক এক জায়গায় এক এক রকম সাপোর্ট দেব। পশ্চিমবাংলায় আমি সি, পি, এম, উত্তরপ্রদেশে জনতা (এস), মধ্যপ্রদেশে জনতা, তামিলনাড়ুতে আন্না ডি, এম, কে—।'

পার্বতীকে থামিয়ে দিয়ে মহাদেব বলেন, 'অর্থাৎ তুমি হচ্ছ গিয়ে চরম সুবিধাবাদী।'

পার্বতী পালটা জবাব দেন, 'মোটেই নয়। আমি বাস্তবপন্থী। সি, পি, এম, অনেক কাজ করতে চাইছে পশ্চিম বাংলায়।'

কিন্তু ওরা যে পুজো-টুজো মানে না, ধর্ম মানে না'—।

'বাজে কথা। সুবিধামত ওরাও ধর্ম মানে। বহু সি, পি, এম, নেতা পাঁচ বেলা নামাজ পড়েন, মক্কায় গিয়ে হাজি হন।'

'কিন্তু ওরা কম্যুনিস্ট হলেও মুসলমান'—

'কিছু হিন্দু-কম্যুনিস্টও আছেন। বাজে ভ্যাজর ভ্যাজর না করে কলকাতায় গিয়ে এবার খোঁজ নাও, দেখবে দু'একজন জাঁদরেল নেতার বাড়িতে দুর্গাপূজা হচ্ছে। ও-সব এলোমেলো কথা বলে আমাকে সি পি এম-বিরোধী করতে পারবে না, বুঝলে ?

'বুঝলাম।'

'ছাই বুঝেছ। তুমি তো ইন্দিরার চেহারা দেখেই ভুলেছ। আমাকে অনেক ভেবে-চিন্তে ডিসিশন নিতে হয়।'

চেহারা-টেহারা নয় গিন্নি, ইন্দিরার গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা। রুদ্রাক্ষ আমার ভারি পছন্দ।

'তোমার পছন্দ আমার জানা আছে। নন্দী-ভৃঙ্গী ডাকিনি-যোগিনী শ্মশান-মশান—

'আসল পছন্দের কথা তো বললে না?

'আর কী?

'তোমাকে পছন্দ করেছিল কে?'

পার্বতীর মুখ রক্তিম হল। গালে টোল ফেলে ধরা ধরা গলায় বললেন, 'সে আলাদা কথা। কিন্তু যাই বল বাপু, ভোটের বেলায় আমি কিন্তু—'

মহাদেব আসন ছেড়ে উঠে বলেন, 'সে যা খুশী তুমি কর। তোমারও ভোট নেই, আমারও ভোট নেই। তা ছাড়া দেবতাদের বরে-টরে কোন কাজ হয় না আজকাল। বারোটা কংগ্রেস তেরটা জনতা চোদ্দটা কম্যুনিস্ট লড়াই করে মরুক, আমাদের তাতে কী? আমরা কোনদিকে নেই। তার চেয়ে বরং চল একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি। কী সুন্দর শরৎকালের রং ধরেছে, আকাশে শিউলি ফুলের গন্ধ যেন আসছে দূর বাংলা থেকে।'

পার্বতী মহাদেবের হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন ডুয়েট গান গাইতে গাইতে।

॥ ষোল ॥

এক অদ্ভুত ডাক্তারের খোঁজ মিলেছে। নিশ্চয়ই ছিটগ্রস্ত, নিশ্চয়ই হাতুড়ে, নইলে এমন করবেন কেন। ভদ্রলোক দুপুর হোক মাঝরাত্তির হোক রোগীর ডাক পেলে যাবেনই। তাঁর ফি সেই কবে থেকে আট টাকায় দাঁড়িয়ে আছে। রোগী বেড়েছে বলেই ফি বাড়ান নি এবং কী বোকা, কী বোকা, ফি-এর টাকার

বদলে রসিদ লিখে দেন। এমন কি চেক দিলেও অম্লান বদনে গ্রহণ করেন। ভদ্রলোকের ডাক্তারীও বেশ মজার। চেম্বারেই হোক বা বাড়িতেই হোক রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেন। নাড়ী দেখেন, বুক দেখেন, জিব দেখেন। রোগীর আত্মীয়স্বজনরা এলোমেলো প্রশ্ন করলেও দুর্বাসা মুনির মত তাকান না। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, বুকের ব্যারাম হলে হাঁটু এবং তালুর এক্স-রে নিতে বলেন না, অমুক ল্যাবরেটরিতে রক্ত বা থুথু পরীক্ষার জন্য হুকুম দেন না এবং প্রতিদিন একগাদা নতুন নতুন ওষুধের বিধান দিয়ে রোগীকে নতুন রোগের গহ্বরে ফেলে দেন না।

হালের ডাক্তারী যে কত অ্যাডভান্সড্ কত মডার্ন তার খবর রাখলে এই হাতুড়ে জানতে পারতেন, আজকাল নিজের হাতে কেউ চিকিৎসা করে না। নিজের হাতে চিকিৎসা করেন বলেই তো এইসব সেকেলেদের হাতুড়ে বলা হয়। ওষুধের কথা বলে দেবেন তো মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভরা। কত নতুন নতুন ওষুধ বেরোচ্ছে। তার খবর রাখতে গেলে প্র্যাকটিস করা হবে কখন? ডায়াগনসিস ব্যাপারটাও আজকাল অনেক সায়ান্টিফিক হয়ে গেছে। সে সর্দিই হোক আর আমাশয়ই হোক, রোগীর বাড়িতে ঢুকেই অন্তত কুড়িটা এক্স-রের বিধান দিতেই হবে। রোগীর আত্মীয়দের সুবিধের জন্যে ডাক্তার নিজেই বলে দেবেন কোথায় কত টাকায় এক্স-রে করাতে হবে। তারপর রক্ত থুথু ইউরিন ইত্যাদি ডাক্তারেরই চেনা জায়গায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে রোগীর আত্মীয়দের কাজ অনেকটা হাল্কা করে দেবেন। ডাক্তার না বলে দিলে অনর্থক ঘোরাঘুরি করতে হত আজেবাজে জায়গায়। রোগী হয়ত হিক্কা তুলছেন, কিন্তু ওই সব রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ডাক্তার কিচ্ছু বলবেন না, শুধু মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভদের পরামর্শমত গাদা গাদা পিল খাইয়ে আর ইনজেকশন দিয়ে রোগীকে ঝিম ধরিয়ে রাখবেন। রিপোর্টগুলি আসার পর অন্তত দুজন স্পেশালিস্টকে আনতে হবে। তিনজন হলে ভাল হয়। ধরুন

কারো মাথায় ব্যথা। ডানদিকের ব্যথার জন্যে একজন স্পেশালিস্ট, বাঁদিকের ব্যথার জন্যে আর একজন স্পেশালিস্ট এবং মাঝখানের ব্যথার জন্যে তিন নম্বর স্পেশালিস্ট। সর্দির ব্যাপারে প্রয়োজন হয় দু জনের। নাকের ডান ফুটোর জন্যে একজন এবং বাঁ ফুটোর জন্যে আর একজন।

অথচ যে অদ্ভুত ডাক্তারের সন্ধান এই সেদিন পেয়েছি, তিনি আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে স্পেশালিস্টদের অবদান সম্পর্কে কিছুই জানেন না। জানেন না স্পেশালিস্টদের কনসালটেশন কী এলাহি ব্যাপার। রোগীর পরীক্ষা হয়ে গেলেই আত্মীয়স্বজনকে সরিয়ে রেখে ডাক্তাররা বাইরের ঘরে দরজা ভেজিয়ে কনসালটেশনে বসেন। দিল্লিতে আগামী কনফারেন্সের কথা, রাইটার্সে হেলথ সেক্রেটারির কুকীর্তির কথা, মেডিকেল কাউন্সিলের অপদার্থতার কথা সবিস্তারে আলোচনার পর বাই-দি-বাই রোগীদের প্রসঙ্গে তাঁরা আসেন এবং অনিবার্যভাবে তিনজন তিন রকম মত দেন। আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর একটা রফা করে একটা ডায়গনসিসই হয় শেষ পর্যন্ত। তবু যদি কোন মতান্তর থাকে, তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই রোগ বেছে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে মডার্ন মেডিকেল সায়ান্সে। তিনজন থাকলে ভোটাভুটি, দুজন থাকলে লটারি। হেড হলে টাইফয়েড, টেল হলে নিউমোনিয়া। কিন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজনকে এত সহজ নাম বললে চলবে না। টেরিডোফাইডা ট্যাণ্টামাউণ্ট কিংবা হিবিস্কাস মনোকটোলিডন না বললে রোগীর আত্মীয়স্বজনরা বড় ডাক্তার বলে ভাববেই না। সেই কারণেই ক্লোজ-ডোর কনসালটেশন সারার পর রোগীর চিন্তিত আত্মীয়দের ডেকে এনে গম্ভীর মুখে ওইসব নাম বলতে হবে এবং অতি দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে খস খস করে গোটা পাঁচিশ ওষুধের নাম লিখে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। তারপর জনে জনে মোটা ভিজিট পকেটে পুরে বেরিয়ে আসতে হবে। রোগীর আত্মীয়রা স্পেশালিস্টদের হাতব্যাগ গাড়িতে পৌঁছে দিতে দিতে

যে সব প্রশ্ন করেন, সেদিকে কর্ণপাত করতে হয় না। ফলে প্র্যাকটিস খারাপ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

যেসব হাতুড়ে ডাক্তার এখনও মিক্‌শ্চার দেন, এখনও বারবার নানা প্রশ্ন করে রোগের মূলে যেতে চান, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই স্পেশালিস্ট না হতে পারলে এই ডাক্তার-জন্ম বৃথা। স্পেশালিস্টদের মধ্যেও স্পেশালিস্ট হতে পারলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ মিলে যেতে পারে। ধরুন একটি ছেলে বাড়ির তিনতলা থেকে পড়ে হাত ভাঙল। আপনি হাতের ডাক্তারের কাছে গেলেন। যেতেই উনি বলবেন, আমি বাড়ি থেকে পড়ে ভাঙা হাত জোড়া লাগাই না, আমি গাছ থেকে পড়ে হাড় ভাঙার ডাক্তার। গেলেন আর একজন স্পেশালিস্টের কাছে। তিনি বাড়ি থেকে পড়ে হাত ভাঙার ডাক্তার। যেতেই যখন জানলেন তিন তলা থেকে পড়েছে, তিনি বলবেন আমি চারতলার থেকে পড়ার ডাক্তার। এবার গেলেন তিন তলার স্পেশালিস্টদের কাছে। তিনি মুখ খিঁচিয়ে এবং চোখ পাকিয়ে বলবেন, 'আমি তিনতলা থেকে পড়ে হাত ভাঙার ডাক্তার বটে, তবে হাতের নয়, পায়ের। অবশেষে গেলেন তিনতলা থেকে পড়ে হাত ভাঙার ডাক্তারের কাছে। তিনি সব শুনে এবং ফি নিয়ে বললেন, 'সরি, আমি তিন তলা থেকে পড়ে হাত ভাঙার ডাক্তার ঠিকই, কিন্তু ডান হাতের। এ কেস তো বাঁ হাতের।' গাছ নয়, টিলা নয়, বাড়ি, অর্থাৎ বাড়ির তিনতলা থেকে পড়ে বাঁ হাতের হাড় জোড়া লাগানোর স্পেশালিস্ট যখন জুটল তখন আপনার মোটা মনিব্যাগ খালি এবং যন্ত্রণায় কাতর বেচারা রোগীর হাত কেটে ফেলার অবস্থা।

তবে হ্যাঁ, এই ধরনের চিকিৎসা করেও আনন্দ। গরিব আত্মীয়স্বজন আর প্রতিবেশীরা বুঝল, একটা কিছু সাংঘাতিক হয়েছে বটে এবং তাকে সামাল দেওয়ার হিম্মত ভদ্রলোক রাখেনও বটে। কিন্তু সেই ছিটগ্রস্ত হাতুড়ে ডাক্তার ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে উঠতে পারেন নি বলেই তার পসারটা তেমন জমল না।

একজন রোগীর পিছনে যদি দুই ঘণ্টা খরচ করেন, যদি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কথা না শোনেন এবং রাশভারী স্পেশালিস্ট না হতে পারেন, তাহলে এঁদো গলিতে গরিবের ডাক্তার হয়েই তাঁকে সারা জীবন কাটাতে হবে। তবে সম্প্রতি শুনতে পেয়েছি বেকামুনের জন্য এই হাতুড়ে ডাক্তারটিকে আর প্র্যাকটিস করতেই দেওয়া হবে না।

॥ সতের ॥

পিছোতে পিছোতে ভারত এখন কোণঠাসা। ক্রিকেটে হার, হকি ফুটবলে হার, বেজোট বৈঠকে হার, সিকিউরিটি কাউন্সিলে হার। ইদানীং আরো কেলেঙ্কারি। অধিক লোকসংখ্যার দেশ হিসাবে এতদিন যে উচ্চাসন ছিল, তাও বেহাত হয়ে গেল। ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়া কানাডা ব্রাজিল এখন লোকসংখ্যার হিসাবে

ভারতের উপরে। এই অবনমনের কারণ ব্যাপক আকারে জন্মনিয়ন্ত্রণ। ষাট কোটি থেকে নামতে নামতে সংখ্যা এখন মাত্র সাড়ে বারো কোটি। অঢেল খাবার, অঢেল জায়গা। চাল আর গম ভারত সাগরে জাহাজ বোঝাই করে ফেলে দেওয়া হয়। ট্রেনে বাসে লোকের ভিড় নেই, বাড়ি ভাড়া নেবার লোক মেলে না। সকলের মুখে হাসি, সকলের পকেটে টাকা। সেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত হবার পর কৃচ্ছ্রসাধন চলেছে দীর্ঘদিন। দারিদ্র্য ছিল চারদিকে। অনেকের নাকি দু'বেলা খাবার জুটত না, ট্রেনে বাসে জায়গা মিলত না, বাড়িওলার মিষ্টিকথা শোনা যেত না। ফুটপাতে লোক ঘুমোতো, চাকরির জন্যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যুবকরা বৃদ্ধ হয়ে যেত, চাষ করার জমি নিয়ে মারদাঙ্গা লেগে থাকত। এখন তার উলটো। অঢেল চাকরি, অঢেল জমি। কাজ আর চাষ করাতে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানি থেকে সস্তার শ্রমিক ও চাষী নিয়ে আসতে হয়। প্রতি বছর বাজেটে তার জন্যে প্রচুর টাকা বরাদ্দ করা হয়।

সেই সঙ্গে আর একটি বড় পরিবর্তন হয়ে গেছে এই বিশাল ভারতবর্ষে। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রধানতঃ হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এখন এদেশে মুসলমানরাই গরিষ্ঠ। সাড়ে বারো কোটির মধ্যে আট কোটিই মুসলমান। যেহেতু নেহেরু-প্রবর্তিত গণতন্ত্রের ছিটে-ফোটা এই একবিংশ শতাব্দীতেও আছে, তাই দিল্লির মসনদে আবার মুসলমান শাসন চলছে। বিনা রক্তপাতে এমন ইসলামী বিপ্লব আর কোথাও হয় নি। বাহাদুর শাহের পর আবার লালকেল্লায় উড়ছে মুসলিম জাহানের পতাকা। সেই পুরানো জাতীয় পতাকার সবুজ অংশ বাড়িয়ে দিয়ে অশোকচক্রের বদলে চাঁদ তারা বসিয়ে পতাকা তৈরি করেছে নতুন সংসদ। জাতীয় সংগীত জনগণ মন পালটানো হয় নি। শুধু বন্দেমাতরম নাকচ করে 'সারা জাঁহাসে আচ্ছা' গানটি ঢোকানো হয়েছে। তবে সংখ্যালঘু হিন্দুরা সত্যি সত্যি সমান অধিকার পায় নতুন

মুসলিম রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইত্যাদি সাধারণ পদগুলি অবশ্যই মুসলমানদের হাতে থাকে, তবে শিক্ষা, পর্যটন, খাদ্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি হিন্দুরা প্রায়ই পেয়ে থাকেন। জোর করে মুসলমান করার কথা নতুন রাষ্ট্রে কেউ ভাবতেই পারে না, তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিন্দু সম্প্রদায়ে আবশ্যিক করে দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপূজা, গণেশ চতুর্থী, দেওয়ালী, বিহু পোঙ্গল মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বহু মানী মুসলমান ওই সব পূজা কমিটির সভাপতিও হন। তবে আজকাল দেওয়ালীর চেয়ে শবেবরাতের রাতে বেশী রোশনাই হয় এবং ঈদের নামাজের কোলাকুলিতে হিন্দুরাও যোগ দিতে পারেন। বিশ্বভারতীর পক্ষে গর্বের কথা, আলিগড় ও জামিয়া মিলিয়ার সমমর্যাদা তাকে দেওয়া হয়েছে। ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ—দু'জনেই সমান জনপ্রিয়।

অনেকে ভেবেছিলেন শরিয়তী শাসন হিন্দুদের মধ্যেও চালু করা হবে। কিন্তু সে ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। শরিয়তী শাসন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চুরি চামারি করলে হাত কাটা বা ব্যভিচারী হলে ইঁট মেরে মেরে একদম মেরে ফেলা অমুসলমানদের মধ্যে প্রযোজ্য নয়। ওদের একই অপরাধে খাঁটি হিন্দুমতে শূলে চড়ানো হয় এবং কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা লেলিয়ে দেওয়া হয়। শিখ খ্রীস্টান বৌদ্ধ জৈনদের জন্যেও স্ব স্ব শাস্ত্রমতে শাস্তির ব্যবস্থাও আছে। সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ বলতে যা বোঝায় ভারত এখন তাই। কাশী পুরী তিরুপতি অমৃতসর বুদ্ধগয়া মীনাক্ষি হরিদ্বার বা দ্বারকার মন্দিরগুলি চমৎকার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু সমতা রাখার জন্যে ওই সব মন্দিরের কাছাকাছি মসজিদও বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রচুর টাকা দেওয়া হয় মন্দির ও মসজিদে, তবে মসজিদের তুলনায় মন্দিরে ভিড় কম। পাণ্ডাদের অবস্থা কাহিল। নেপাল মরিশাস ফিজি বা ত্রিনিদাদ থেকে হিন্দুরা বছরের নানা সময়ে ভারতের হিন্দু তীর্থগুলিতে

প্রায়ই আসেন বলে পাণ্ডারা কোনক্রমে বেঁচে আছেন। তার মধ্যে অবশ্য দু-একজন অধিক দক্ষিণার আশায় মুসলমান হয়ে মসজিদের ইমাম হয়ে গেছেন।

ভারত মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রচণ্ড উল্লাস দেখা দেয়। পাকিস্তানের মিলিটারি শাসনকর্তা এক গোপন বার্তা পাঠিয়ে পাক-ভারত সংযুক্তির প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাবে বাংলাদেশও সায় দেয়। বর্তমানে তিনটি রাষ্ট্র। এক কালে তো একই রাষ্ট্র ছিল, এখন আবার একে তিন তিনে এক হলে বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং নতুন রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান করে দিলেই সব লাঠা চুকে যায়। সমগ্র ভারতীয় উপ মহাদেশের নতুন নামকরণে বাংলাদেশ আপত্তি জানায়। তাদের মত হল, পাকিস্তানের খপ্পরে আর কিছুতেই পড়া যায় না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যখন নাম নিয়ে বিবাদলিপ্ত, তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, পাকিস্তান নাম দেওয়া দূরে থাক, সংযুক্তি প্রস্তাবেই তাঁর সম্পূর্ণ অমত। পাকিস্তান আর বাংলাদেশ ঢুকলেই ভারতের লোকসংখ্যা আরও পঁয়তাল্লিশ কোটি বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের পঁচিশ আর পাকিস্তানের কুড়ি যদি ভারতের সাড়ে বারোর সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে খাওয়া-পরা থাকার আরামের সাড়ে বারোটা বেজে যাবে। শুধু এই নয়, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সীমান্তে যে বিরাট রক্ষী ও সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রয়েছে তারা সবাই বেকার হয়ে পড়বে, দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। তাছাড়া ভারতে এখন কাশ্মীর ও গঙ্গাজল ছাড়া কোন সমস্যাই নেই। তাই নিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে চিঠি-চালাচালি ও ধমকাধমকি যদি না চলে, তাহলে সরকারের কোন কাজকর্মই যে থাকে না। দেশের প্রত্যেকটি লোক শিক্ষিত, প্রত্যেকের খাবার ও বাড়ি আছে, জনপ্রতি আয় পৃথিবীতে সর্বাধিক, অসুখ-বিসুখের বালাই নেই, ভাষা নিয়ে বিরোধ নেই, সবাই উর্দু পড়ে। এবং

দিল্লি ওই কাশ্মীর গঙ্গাজল আর সীমান্ত পাহারা নিয়েই তো সরকার চালায়, কাগজে বিবৃতি দেয়, প্রেস কনফারেন্স ডাকে। সুতরাং সংযুক্তি প্রস্তাব কভী নহী কভী নহী।

পাক-বাংলা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাওয়ার পর ভারতীয় উপ-মহাদেশে আরো কিছু নাটকীয় পরিবর্তন হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে। পাকিস্তান ঘোষণা করল হিন্দুস্তানের মুসলমানরা না-পাক, এরা মুসলমানই নয়, এদের সঙ্গে চলাফেরা গুণাহ্। ওদিকে বাংলাদেশের দুর্দান্ত নাইন্থ টাঙ্গাইল রেজিমেণ্ট পশ্চিম দিনাজপুর আক্রমণ করে বসল। ভারত ঢাকার উপর অ্যাটম বোমা ছাড়বে কিনা ঠিক করার আগেই অবশ্য বাংলাদেশের সৈন্যবাহিনী পিছু হঠে 'সাফল্য' ঘোষণা করে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে উঠল এবং ভারত সেই বিংশ শতাব্দীর মতো পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিরোধিতা তার বিদেশ মন্ত্রকের প্রধান মূলধন করে এবং সীমান্ত পাহারা প্রতিরক্ষা অর্থ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একমাত্র কাজ বলে গণ্য করে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল। ইতিমধ্যে হিন্দু সমাজে জন্মশাসনের জনপ্রিয়তায় মুসলমানদের আনুপাতিক হার বছর বছর বাড়তে লাগল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফুটবল হকিতে ভারত যথারীতি গোহারা হারতে লাগল। তবে হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে চার বিবির বদলে তিন বিবি করা যায় কিনা সেই সম্পর্কে দেশের নেতারা ইদানীং ভাবতে শুরু করেছেন। ফুটবল হকি ক্রিকেটে আনুপাতিক হারে হিন্দু মুসলমান খেলোয়াড় নিয়ে হার এড়ানো যায় কিনা সেই সম্পর্কেও বিবেচনা করতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ক্রীড়া কমিটি বসানো হয়েছে।

॥ আঠার ॥

বিশ্বকর্মা ও মাদুর্গা কীভাবে এক চালচিত্রে চলে এলেন, তা নিয়ে এখনও পণ্ডিতমহলে গবেষণা চলছে। তবে এইটুকু মাত্র জানা গেছে, এককালের কেরানি বাঙালী জাতি শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হওয়ায় বিশ্ব-কর্মার কদর বেড়ে বেড়ে এবং সনাতন দুর্গাপূজা লোপ পেয়ে নতুন বিশ্ব-দুর্গা পূজার প্রচলন হয়েছে।

সেকালের দুর্গাপ্রতিমার ছবি অবশ্য পুরোনো বাংলা বইয়ে দেখা যায়। শিব লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ নিয়ে সিংহবাহিনী মূর্তি এখন বারোয়ারী পূজামণ্ডপ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে স্থান নিয়েছে। এই দ্বাবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বদুর্গা নামে যে প্রতিমার পূজা হয় প্রতি বৎসর শরৎকালে, তার চেহারা একেবারে অন্য রকম। চালচিত্রের উপরে মহাদেবের বদলে আছেন বিশ্বকর্মা। লেখাপড়ার পাট নেই তো, তাই সরস্বতী মূর্তি বাদ দিয়ে দুদিকেই লক্ষ্মী মূর্তি। কার্তিক গণেশের বদলে একদিকে বোনাস ঠাকুর অন্যদিকে ওভারটাইম বাবা। বোনাস ঠাকুরের চার হাত। প্রত্যেকটি হাতে একটি করে পতাকা। তাতে লেখা—চাই, চাই, চাই, চাই। ওভারটাইম বাবার কোন হাত নেই; অনেকটা জগন্নাথের মত। তিনি নিষ্কর্মা কিনা। মাঝখানে দুর্গার চেহারা অনেকটা প্রাচীর মূর্তিরই মত, তবে তাঁর পদতলে মহিষাসুরের বদলে আছে মালিক এবং এই মলিকাসুরকে আক্রমণ করছে একজন ট্রেড ইউনিয়ন লীডার। মালিকের চেহারা অনেকটা মহিষাসুরের মতই এবং ঘাড়ে গর্দান সমান শ্রমিক নেতা একেবারে নরশার্দুল।

এই বিশ্বদুর্গা পূজার প্রচলন এখন ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায়। তবে পূজাপদ্ধতিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগেকার মত পুরুতের অং বং মন্ত্র, উলুধ্বনি, কাঁসর ঘণ্টা বাজনা, ঢাকীর ঢ্যাম কুড় কুড় নেই। যেহেতু বিশ্বদুর্গা কলের দেবতা সেই জন্যে পূজার কাজকর্ম বেশিরভাগ কলের সাহায্যে সারা হয়। তাছাড়া বড় সমস্যা হল, আজকাল পুরুত বলে আলাদা কেউ নেই। সবাই শ্রমিক। প্রাচীনপন্থী পূজার কায়দা কানুন জানেন এবং সংস্কৃত মন্ত্র পড়তে পারেন এমন লোক আর মাথা খুঁড়লেও মিলবে না। তাই একালে অনেক আধুনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিউ পুরোহিত দর্পণের মেড ইজি সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় টেপ রেকর্ড করে রাখা আছে। আলাদা আলাদা ক্যাসেটে ঘণ্টা নাড়ার শব্দ, ঢাকের আওয়াজ, উলু বা শংখধ্বনি

টেপবন্ধ। সরকার সামান্য ফি-এর বিনিময়ে প্রতি বছর এইগুলি পূজা মণ্ডপে বিলি করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে চা ও পাট চাষ উঠে যাওয়ার পর সরকারের এটাই সবচেয়ে বড় আয়। কলকারখানার গোটা রাজ্য ছেয়ে গেছে বটে, কিন্তু কোনটা থেকেই আয় হয় না। সবই সিক ইনডাসট্রি। পূজার সময় কোন দিন কোন টেপ কখন বাজবে তার জন্যে প্রত্যেক পূজামণ্ডপে কম্পিউটরের ব্যবস্থা আছে। বহুকাল আগে যেখানে কলাবৌ ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ঠিক সেইখানে কম্পিউটার যন্ত্রটি বসিয়ে রাখা হয়। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে। এই যন্ত্রগণক পূজা পরিচালনা করে। একটু খোঁনা খোঁনা আওয়াজ হয় বটে, উচ্চারণেও একটু আমেরিকান অ্যাকসেণ্ট, তবে কোনটা সংস্কৃত মন্ত্র, কোনটা ঢাকের আওয়াজ মোটামুটি বোঝা যায়। কম্পিউটারের পরামর্শেই মন্ত্রপাঠের মাঝখানে মাঝখানে মিউজিক দেওয়া হয়েছে। নইলে বড় নীরস ও একঘেঁয়ে লাগে। বোঙ্গো পিয়ানোএকোর্ডিয়ান ও সরোদ সেতারে মেশানো যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে মন্ত্রসংগীত চমৎকার শোনায়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা দেবীপ্রতিমার সামনে সেই সংগীতের সঙ্গে নাচেও।

পূজার অন্যান্য ব্যাপারও সেকেলে নয়। পোটোপাড়ায় প্রতিমা-শিল্পীরাও এখন কারখানার শ্রমিক। বছর বছর নতুন প্রতিমা গড়ে বিসর্জন দেবার বিলাসিতা আর চলে না। তাই প্লাসটিকের ফোলডিং প্রতিমা আজকাল জাপানে তৈরি হচ্ছে। তারই পালটা আর এক ধরনের প্যাকেট-মূর্তি তৈরি হয় জার্মানিতে, যেগুলি এমনিতে চুপসানো বেলুনের মত, ফুঁ দিয়ে ফোলালেই পুরো প্রতিমা হয়ে যায়। দুই ধরনের মধ্যে যে কোন একটা বসানো হয় মণ্ডপে। পুজো হয়ে যাওয়ার পর নম্বর সেঁটে মিছিল করে দিয়ে আসা হয় সরকারী গোডাউনে। গঙ্গার ধারে আগে ফোর্ট উইলিয়াম নামে যে দুর্গ ছিল, সেটিই প্রতিমা গোডাউন হিসেবে আজকাল ব্যবহার হচ্ছে।

প্রসাদ বিতরণও আর সেকেলে নয়। পুরো ভার ক্যাটারারের

উপর। অষ্টমীতে ভেজিটারিয়ান, অন্যদিনে নন-ভেজিটারিয়ান। উর্দিপরা বেয়ারারা চিকেন খাউমিন, কাঁঠাল মুসল্লম, হাইটি-ডি-খাইটি ইত্যাদি খাবার পূজামণ্ডপেই পরিবেশন করে। তার সঙ্গে একটি করে বাতাসাও দেওয়া হয়। হোমের ব্যবস্থাও বরবাদ হয় নি। কম্পিউটার নামক যন্ত্রটি নানা রকম আলো ফেলে যজ্ঞাগ্নির চেহারা দেয়। মঞ্চে আলোক-সম্পাতের কাজ করেন, এমন দু-একজন শিল্পীর সাহায্যও নেওয়া হয় এই ব্যাপারে। একজন আলোকসম্পাতীর খুব কদর। তিনি জাল ধোঁয়া পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর মায়াবী আলোতে। বিজয়াদশমী আছে, তবে বিজয়া সম্মিলনী নাম দিয়ে কোলাকুলি ব্যাপারটা উঠে গেছে। এখন এই দিনটিকে থ্যাংকস গিভিং ডে বলে চালানো হয়। বাড়িতে স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা মিলে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়া এবং জীবিত থাকলে ওল্ড এজ হোম থেকে মা বাবাকে ডেকে এনে খাওয়ানো এই দিনটির বৈশিষ্ট্য। মা বাবা ছেলের বৌকে থ্যাংকস দিয়ে আবার তাঁদের ডেরায় চলে যান।

এই পূজাপদ্ধতির ভিতর এবার একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে সম্প্রতি। কোচবিহারের এক পূজা কমিটি এক ভদ্রলোককে আবিষ্কার করেছেন—যিনি নাকি পুরানো সংস্কৃতমন্ত্র পড়তে পারেন। ভদ্রলোক পাতাল রেলের ড্রাইভার। কোচবিহার স্থির করে তারা এবার টেপ-রেকর্ডে মন্ত্র পড়বে না। তাই ড্রাইভার ভদ্রলোক প্রচুর টাকার লোভে তিনদিনের ক্যাজুয়েল লীভ নিয়ে পুজো করতে চলে যান। তাঁকে পেয়ে সারা কোচবিহারে হই চই। কলকাতা গৌহাটি বহরমপুর পাটনা থেকে লোক যায় কোচবিহারের সেই বারোয়ারী বিশ্বদুর্গাপূজা দেখতে। সংস্কৃত পড়তে পারে এমন লোক ভারতবর্ষে আছে কেউ জানত না। পাতাল রেলের ড্রাইভার মিস্টার এস পি চক্রবর্তীরা আজ চার-পুরুষ শ্রমিক। তবে তার আগে তাঁদের নাকি পেশা ছিল যজমানী। মিঃ চক্রবর্তী গরদের একটা স্যুট পরে প্রতিমার

সামনে একটা টেবিল-চেয়ার পেতে বসে পড়লেন। হাঁটু মুড়ে বসতে পারেন না বলেই এই ব্যবস্থা। তাঁর মুখের সামনে মাইক। তিনি বিশ্বদুর্গার ধ্যান মন্ত্র অনর্গল পড়ে যেতে লাগলেন, 'যা দেবী সর্ব কলেষু চুক্তি-রূপেন সংস্থিতাঃ, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।' ভদ্রলোক এক একটি শ্লোক পড়েন আর জনতার হাততালি পড়ে। এখনকার মন্ত্রের বিধান অবশ্য বিরাট নয়। মেড ইজি সিওর সাকসেস গোছের সংক্ষিপ্ত কেতাব বেরিয়েছে। তারই একটা পনেরো মিনিটে পড়ে সবশেষে তিনি বললেন—'ঘেরাওং দেহি, বোনাসং দেহি ওভারটাইমং দেহি।' পূজোর মন্ত্রপাঠ শেষ হতেই মিঃ চক্রবর্তী চেকে তাঁর ফি নিয়ে বাগডোগরা চলে যান। সেখান থেকে প্লেনে কলকাতা। ক্যাজুয়েল লীভ শেষ।

কলকাতায় কিছু লোক এই ঘটনা বিশ্বাস করে নি। এই অবিশ্বাসীদের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন দয়া করে কোচবিহার ক্রনিকল-এর ইণ্টার-ন্যাশনাল এডিশনটা একবার দেখে নেন। কাগজটির স্পেশাল নবমী ইস্যুতে ওই ড্রাইভার পুরুতের সচিত্র ইণ্টারভিউ বেরিয়েছে। চৌরঙ্গির যে কোন স্টলেই সেই ইস্যু কিনতে পাওয়া যায়।

॥ উনিশ ॥

কলকাতার গাড়িঘোড়ার সমস্যা এত সহজে সমাধান হবে আমরা কেউ ভাবতেও পারি নি। ট্রামে-বাসে কাঁঠালঠাসা ও বাদুড়ঝোলা হতে হতে সবাই যখন বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ, আমাদের নতুন পরিবহণ মন্ত্রী মোক্ষম দাওয়াই ছাড়লেন। তাঁর দাওয়াই অবশ্য অনেকদিন থেকেই আমাদের গিলতে হচ্ছিল, ক্রিয়াটা শুরু

হয়েছে সম্প্রতি। কলকাতার বাসগুলো প্রথমে ছিল এ কিংবা বি। যেমন টু-এ বা টু-বি। এ বি সি ডি ছেড়ে এক লাফে ওঁরা চলে গেলেন অনেক দূরের অক্ষরে। শুরু হল এল। এল থেকে আর এক লাফে এস। সব অর্ডিনারি বাসকে রাতারাতি স্পেশাল বানিয়ে দিতেই আমরা বললাম, বাহবা, এই তো চাই, এবার থেকে আমরা আর অর্ডিনারি রইলাম না, এস অক্ষরে কিছুদিন থাকার পর গত বছর আমরা পৌঁছে গেছি ইংরেজি বর্ণমালার শেষ অক্ষরে। এখন সব বাস জেড। অর্থাৎ জিরো। সব বাস বললে অবশ্য ভুল বলা হয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল থেকে রেড রোড বরাবর আকাশবাণী ভবন অবধি ওই একটি মাত্র ওআন—জেড বাসরুটই চালু আছে কলকাতায়, অন্য সব রুট তুলে দেওয়া হয়েছে। ওআন—জেড রুটটি টুরিস্টদের জন্যে। ভাড়া-করা কিছু লোককে ওই বাসে পুরে দেওয়া হয়। তাঁরা পাদানিতে ঝোলেন, ভেতরে ষাট জনের জায়গায় তিনশ' তিরাশিজন দাঁড়ান এবং বসেন। এই অত্যাশ্চর্য সার্কাস দেখার জন্যে বহু দূর দূর থেকে লোকরা আসেন এবং ছবি তুলে নিয়ে যান।

২০৭২ সালে পাতাল রেলের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় ট্রাম বা বাসে চড়া অনাধুনিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। পাতাল রেল অবশ্যি দমদম থেকে টালিগঞ্জ হয় নি। আপাতত এলগিন থেকে এসপ্ল্যানেড—এই হচ্ছে তার সীমানা। এই দু তিন কিলোমিটার রাস্তাই কলকাতার পরিবহণ সমস্যাকে অনেক সরল করে দিয়েছে। তেলের অভাবে ট্যাক্সি মিনিবাস আর চলে না। ভারতে যে অল্প তেল পাওয়া যায়, তা দিয়ে মিলিটারির কাজ কোনক্রমে চলে। বিদেশ থেকে আমদানি একেবারে বন্ধ। তার জের পৌঁছেছে কলকাতাতেও। ডিজেলের অভাবে সব প্রাইভেট বাস কবেই উঠে গেছে। স্টেট বাসের অবস্থাও তাই। তবে সেই সনাতন কয়েক হাজার কর্মী এখনও আছেন। আছে অনেকগুলো ইউনিয়ন। বাস নেই, তাই আয় নেই, কিন্তু যেহেতু সরকার জনকল্যাণী, সবাইকে মাইনে

দিয়ে পুষে রাখা হয়েছে। কর্মীরা ইউনিয়নের দাদাদের নেতৃত্বে মাঝে মাঝে মিছিল করেন, বোনাসের জন্যে দাবি তোলেন এবং ধর্মঘটের হুমকি দেন। অফিসাররাও সারাদিন ফাইল নিয়ে ব্যস্ত। তাঁদের প্রমোশন ইত্যাদি নিয়ে প্রায়ই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেন। মুখ্যমন্ত্রী সেগুলি পরিবহণমন্ত্রীর কাছে পাঠান। যে চার-পাঁচ শ' বাস ছিল, সেগুলো ধাপায় ফেলে দেওয়া হয়। ময়লার সঙ্গে মিশে মিশে ওগুলোর চিহ্নমাত্রও আর নেই।

এইভাবে গাড়িঘোড়ার অভাব চলতে চলতে নগরবাসী যখন প্রায় বিনোবা ভাবে হয়ে উঠেছেন, তখন একজন ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায় চলন্ত ফুটপাত চালু করা হল কলকাতায়। ট্রাম-বাস মিনি-ট্যাক্সির তোয়াক্কা আর কেউ করে না, এসকেলেটারের মত সব ফুটপাত চলন্ত করে দেওয়ার পর থেকে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। বিনিপয়সায় সদর রাস্তা দিয়ে যখন খুশি যেখানে খুশি যাওয়া তো যায়ই, হকাররা আর ফুটপাত দখল করে এক জায়গায় বসতে পারছেন না। চলন্ত ফুটপাত চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকায় টালিগঞ্জের হকার নিমেষে পৌঁছে যাচ্ছে বড়বাজার। শ্যাম-বাজারের হকার বমাল চলে যাচ্ছে পার্ক সার্কাস। মাল বিক্রির এমন সুব্যবস্থা আর কোথাও নেই। না হেঁটে ফিরিওলার মত তারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পাবে। তাদের পোয়াবারো। পোয়া-বারো অফিস যাত্রীদেরও। মিনিবাসে লাইন দিতে হয় না, ট্রামে-বাসের গাদাগাদিতে দম বন্ধ হয়ে আসে না,—বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে যখন খুশি পা দিলেই হল। আপনা আপনি পৌঁছে যাবেন গন্তব্যস্থলে। মোড়ে মোড়ে একটু সাবধান থাকলেই হল। দু-তিনটে এসকেলেটার আসছে যাচ্ছে, লাফিয়ে এদিক-ওদিক গেলেই হল। হাসপাতালে রেল স্টেশনে সিনেমায় বা দোকানে যেতে হলেও একই ব্যবস্থা। ত্রিশ কিলো পর্যন্ত মাল সঙ্গে নেওয়া চলে। তবে চলন্ত ফুটপাত নিয়ে দুটি অসুবিধা দেখা দেয়। প্রথমত স্ট্যাণ্ডোটাইটিস নামে একটা অসুখ কলকাতাকে পীড়িত

করে রেখেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে নাকি এই রোগ হয়। দ্বিতীয়ত চলন্ত ফুটপাতের স্পীড বড় কম। দ্রুত যাবার তাড়া থাকলে চলন্ত ফুটপাতে কাজ চলে না। স্পীড কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু নানা লোকের নানা চাহিদা থাকায় সরকার ঘণ্টায় পনেরো কিলোমিটার বেঁধে দিয়েছেন। এই অবস্থার মধ্যে চলন্ত ফুটপাত যাত্রী-সঙ্ঘ নামে একটা ইউনিয়ন গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের দাবি হয় স্পীড বাড়াও, নয় বিকল্প ব্যবস্থা নাও। পাল্টা আর একটি ইউনিয়ন—চলন্তিকা—পাল্টা দাবি তুলে বলেছে, স্পীড বাড়াতে দেওয়া চলবে না, চলবে না, চলবে না। সরকার প্রথমে ভেবেছিলেন দ্রুতগতি ও মন্দগতি নাম দিয়ে দু'রকমের চলন্ত ফুটপাত তৈরি করে দেবেন কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্ক এই বাবদ টাকা আর দিতে রাজি না হওয়ায় পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়। অবশেষে পরিবহনমন্ত্রী অনেক ভেবেচিন্তে নতুন একটা ব্যবস্থা নিয়েছেন, যাতে দেখা যাচ্ছে যাত্রিসাধারণের মনে আর কোন ক্ষোভ নেই।

পরিবহণমন্ত্রীর প্রস্তাবমত মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকে সম্প্রতি স্থির হয়েছে, যাঁরা মন্দগতি চলন্ত ফুটপাতে চড়তে অনাগ্রহী, তাঁদের প্রত্যেককে পরিবারপিছু পাঁচটি করে রণপা দেওয়া হবে। রণপা বাঙালীর ঐতিহ্য, রণপা বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। এই রণপা চড়েই একদা বাঙালী দিকে দিকে ডাকাতি করেছে, ঘরে ঘরে আতঙ্ক তুলেছে। রণপা চড়তে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হচ্ছিল। সরকার প্রাচীন ডাকাতকুলের তিন-চারজন নাতির নাতিকে জোগাড় করে এনে রণপা ট্রেনিং স্কুল খোলেন ব্যারাকপুরে। মাত্র দু' ঘণ্টার কোর্স। এখন কলকাতার প্রত্যেকেই অনায়াসে রণপা চড়তে পারে। রণপার স্পীড যেমন বেশি, তেমনি অন্য সুবিধাও বিস্তর। বর্ষাকালে কলকাতা প্রায়ই জলে ডুবে থাকে, রণপা থাকলে জলে আটকা পড়ার সম্ভাবনা নেই। অনেকে রণপার দুটো লাঠির সঙ্গে এক ধরনের ছাতাও লাগিয়ে নিয়েছেন,

তাতে রোদ বৃষ্টির ভয় নেই। তাছাড়া পা রাখার কাঠিতে ও হাত ধরার জায়গায় অনেকে ফোম লেদার লাগিয়ে নিয়েছেন। রাত্রে চলার জন্যে আলোর ব্যবস্থাও আছে।

নানা রঙের নানা কারুকাজের এই রণপাগুলোর বাহার কত। প্রতি দু' বছর অন্তর নতুন রণপা দেওয়া হয়। ফ্রি। চাহিদা এত বেশি যে, দেশী মালে সব জোগান দেওয়া যায় না, বিদেশ থেকে প্রচুর আমদানি করতে হয়। 'ওয়াকি-স্টিকি' নাম দিয়ে লস এঞ্জেলেস ও শিকাগোর কারখানায় প্রচুর রণপা তৈরি হয়। আমেরিকার বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রির মধ্যে এটি একটি। দেশী রণপার চেয়ে বিদেশী রণপার চাহিদা বেশি। বিদেশী রণপাতে ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত স্পীড ওঠে। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কম থাকে। পথে দেশি রণপায় প্রায়ই ঠোকাঠুকি হয় এবং স্পীডের মাথায় অনেক সময় ভেঙে পড়ে। তবে দু'-একটা দুর্ঘটনা হলেও কলকাতা এখন রণপা আর চলন্ত ফুটপাতের দৌলতে পরিবহণের সমস্যা মুক্ত। যে-কোন দিন ভিড়ের সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে চোখ বুঁজলেই দেখতে পাবেন লাইন-বাঁধা নারী-পুরুষেরা কী সুন্দর রণপা চড়ে গান ধরেছেন—'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।'

॥ কুড়ি ॥

এ এক মহাফ্যাসাদ। যতবারই অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়, ততবারই ভোট ভাগাভাগি হয়ে যায়, নিরংকুশ গরিষ্ঠতা কেউ পায় না। ঢাকঢোল বাজিয়ে এবং গৌরী সেনের টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়ে এক একবার ভোট হয় আর ফল বেরোলে দেখা যায় চারটি দল সব আসন প্রায় সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। কেউ ১০০,

কেউ ১৪০, কেউ ১৩২, কেউ ১৩৮—এই রকম। দুটো দল হাত মেলালেও ঠিক ঠিক মেজরিটি হয় না। তিনটি দল হাত মেলালে হয়, কিন্তু তিন দূরে থাক, দুই দলও এক হয় না। অতএব সরকার গড়বে কে? একবারের নির্বাচনে তো আরো কেলেঙ্কারি। জয়ী নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা এত বেশি হল যে, রাষ্ট্রপতির মাথায় হাত। নতুন সরকার গড়ার ভার সমবেত নির্দলদের দিতে হয়। কিন্তু নির্দলদের সকলেই স্বয়ম্ভু বলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাই নিয়ে এত মারামারি শুরু হল যে, সরকার গড়া আর হল না, রাষ্ট্রপতি বিশেষ ক্ষমতাবলে আবার অন্তবর্তী নির্বাচনের হুকুম দিলেন। তাতে অবশ্য লাভ হল না, অবস্থা যে-কে সেই, ৫৪০টি আসন প্রায় সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে বড় চারটি দলে। এদেশের সব উন্নয়নকর্ম বন্ধ, পাঁচশালা যোজনা শিকেয় উঠেছে, রাজকোষের যাবতীয় টাকা ভোট বাবদ খরচ হয়ে যাচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাংকের ভাঁড়ার খালি হতেই চড়া সুদে বিশ্বব্যাংক থেকে টাকা ধার নেওয়া হল, তবু নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, ইলেকশন আর ফুরোয় না।

এইভাবে একের পর এক আঠারোটি অন্তবর্তী নির্বাচন হয়ে গেল সাত বছরে। বরাবরই রেজাণ্ট ড্র। তিতিবিরক্ত ছয়জন ইলেকশন কমিশনার পদত্যাগ করলেন। লোকসভায় পর পর তিনটি ভোটের পর আর একজন ইলেকশন কমিশনার তো স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন। সারা ভারতবর্ষের যাবতীয় সরকারী কর্মচারী অন্য সব কাজকর্ম ফেলে ওই ভোট নিয়ে ব্যস্ত। সেই সঙ্গে সমস্যা দেখা দিল আরো অনেকগুলি। ইলেকশন কমিশনার হতে কেউ আর রাজি হন না, প্রস্তাব এলেই মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করে বিদেশে পালান। আটক আইনে ধরে চীফ ইলেকশন কমিশনার করা যায় কিনা, সে চেষ্টাও হয়েছিল কিন্তু জনমত তার বিরুদ্ধে এত প্রবল হল যে, তদারকি সরকার এই ব্যাপারে আর এগোলেন না। এদিকে তদারকি সরকারের অবস্থাও কাহিল। গদিতে থাকার কথা ছিল কুললে পাঁচ মাস, কিন্তু সাত সাতটি

বছর পার হয়ে গেল, অন্য কারো গদি দখলের লক্ষণ নেই। কাঁহাতক আর পারা যায়। অন্য দশটা বড় কাজ থাকলে না হয় কথা ছিল। তাহলে ঘন ঘন বিদেশ যাওয়া যেত, উদ্বোধন-দ্বারোদ্ঘাটন করা যেত। তা আর হচ্ছে কই, গোটা প্রশাসনযন্ত্রকে বছরের পর বছর ভোটের কাজে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ফাইল দেখো আর ভোটে নামো। এখন মন্ত্রিত্বে সুখ নেই। এক একবার ফল বেরোয় আর রাষ্ট্রপতি কাঁচুমাচু হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, প্লীজ আরও কটা দিন চালিয়ে দেন না ভাই। প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই রাজী নন, বলেন, ছেড়ে দিন দাদা, কেঁদে বাঁচি। রাষ্ট্রপতি অনেক সাধাসাধি করলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সেই এক কথা, গদি ছেড়ে পালাব, দিল্লি ছেড়ে পালাব।

রেগেমেগে রাষ্ট্রপতি চলে এলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। মোগল গার্ডেন্সে অস্থির পায়ে পায়চারি করতে করতে আপন মনে বলেন, নিকুচি করেছে ডেমোক্রেসির। বাড়ির ভিতরে ঢুকলেই গিন্নি বলবেন, কী হল? তিনি তো রাষ্ট্রপতি ভবন ছাড়ার জন্যে পা বাড়িয়ে আছেন। এ বাড়ি আর সহ্য হয় না। পার্টি নেই, বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক নেই, শপথ অনুষ্ঠান নেই, বছরে একবার কেবল ছাব্বিশে জানুয়ারিতে কুচকাওয়াজ দেখা। উমা, তাও কী কষ্ট, দশ-দশটি বছর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডান হাত কানের কাছে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।—সেপাই-সামন্তরা বেশ হেঁটে যাচ্ছে, আর তুমি ঠুঁটো জগন্নাথ। তার চেয়ে ঢের ভাল নিজের রাজ্যে গিয়ে খেতখামার করা। কিন্তু এখন কী করা যায়? প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আর গদিতে রাখা যাবে না। তিনি পদত্যাগ করবেনই। পাছে রাষ্ট্রপতি হয়ে যান, সেই ভয়ে উপরাষ্ট্রপতি আগেই পদত্যাগ করে বসে আছেন। এখন উপায় একটিই। আমাকেও পদত্যাগ করতে হবে। তার আগে বাতিল করতে হবে সংবিধান, সারা দেশে জারি করতে হবে এমার্জেন্সি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

ঠিক তাই হল। পদত্যাগের পর পদত্যাগ। দিল্লির সব কটি সিংহাসন খালি। অন্তবর্তী নির্বাচনের ইতি। রাষ্ট্রপতি বিদায় নেবার আগে মিলিটারির তিন কর্তাকে ডেকে এনে বললেন, যা করবার করুন, আমি চললাম। মিলিটারির তিন বড় কর্তা—জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সেনাপতিরা কিছুতেই রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন, এত বড় দেশ সামলানো আমাদের কর্ম নয়। তাছাড়া ফাইলটাইল বক্তৃতা-টক্তৃতা আমাদের ধাতে সয় না। আপনি বরং অন্য ব্যবস্থা করুন। রাষ্ট্রপতিও নাছোড়বান্দা।" তিনি দিল্লি ছেড়ে চলে যাবেনই। অবশেষে কাকুতিমিনতি করে বললেন, একটা কাজ করুন অন্তত। আকাশবাণী দখল করে বাজখাঁই গলায় আমার ইস্তফার কথা বলে দিন। মিলিটারিরা তাতেও নারাজ। তা ছাড়া তাঁদের কাজ হুকুম তামিল করা, হুকুম দেওয়া নয়। অতএব অন্য কিছু ভাবা যাক।

তিনদিন তিন রাত রাষ্ট্রপতি ভবনে সলাপরামর্শের পর স্থির হল, ওইসব গণতন্ত্র টনতন্ত্রের দরকার নেই। আমাদের সাবেকী রাজাবাদশার শাসনই ঢের ভাল। রাজ্যে রাজ্যে থাকুক মন্ত্রিসভা আইনসভা নির্বাচন, আর দিল্লির মসনদে বসুন কোন রাজা বা বাদশাহ। গণতন্ত্রের সঙ্গে রাজতন্ত্রের মিশাল দিয়ে ভারত বিশ্ব-রাজনীতিতে নতুন পথ দেখাক।

যেমন কথা তেমন কাজ। রাষ্ট্রপতি গোপনে দিল্লি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারির এক বড় কর্তা হাজির হলেন কাঠমাণ্ডু। রাজা বীরেন্দ্রকে বললেন, "স্যার, নেপাল তো রইলই, আপনি যদি দয়া করে ভারতেরও রাজাধিরাজ হন, তাহলে ভারতবাসী অনুগৃহীত হয়। বীরেন্দ্র বললেন, "মাথা খারাপ। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। আমি ও পথে যাচ্ছিনে। তাছাড়া চীন রেগে যাবে।" কাঠমাণ্ডু ছেড়ে দিল্লি ফেরার পর মিলিটারির সেই কর্তা দেখেন পালাম বিমান-বন্দরে নানারকম জরির পাগড়ি, তরোয়াল আর জমকালো পোশাকের ভিড়। কী ব্যাপার? ব্যাপার সামান্যই।

দিল্লির গদির জন্যে একজন রাজা খোঁজা হচ্ছে জানতে পেরে ব্রিটিশ ভারতের প্রায় পাঁচশ রাজাবাদশার বংশধররা লোহার সিন্দুক থেকে পুরানো পোশাক আর জং ধরা তরোয়াল বের করে এনে উমেদারির জন্যে হাজির হয়েছেন খানিক বাদেই শুরু হল মারামারি। হায়দরাবাদ ভুপালের বংশধররা বলেন, মসনদ আমাদেরই দিন। নবাবা আমাদের রক্তে। বরোদা জয়পুর উদয়পুর ত্রিপুরার বংশধররা ক্ষেপে গিয়ে বলেন, "আবদার নাকি? আমরা হিন্দুরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি।" অবস্থা যখন তুঙ্গে, হঠাৎ দেখা গেল কলকাতার ফুলবাগান বস্তি থেকে হাজির দেদার বখত। শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহের বংশধর। হাতে গোলাপফুল নিয়ে তিনি কুঁই কুঁই করে বললেন, "মগর মসনদ তো হামারই পাওনা হুজুর।"

মিলিটারির কর্তারা দেখলেন মহাবিপদ। কোনক্রমে হেলিকপ্টারে ছাউনিতে ফিরে বিস্তর পরামর্শের পর হুকুম দিলেন পাতাউদির নবাব মনসুর আলি খানই দিল্লির গদিতে বসবেন। তাঁর ঘরানা ভাল, তাঁর বউ হিন্দু—রবীন্দ্রনাথের রক্ত গায়ে—ভাল ক্রিকেট খেলেন, ইংরেজিও বলেন চমৎকার। তিনি চলে গেলে গদিতে বসবেন একজন হিন্দু। এইভাবে চলবে পালা করে। পাঁচজন হোমরাচোমরা মেজর জেনারেল পতাউদিকে জোর করে এনে দিল্লির গদিতে বসিয়ে দিলেন। তাঁর নতুন নাম হল হিন্দুস্তান-উল-মলুক ভারতমিহির মনসুর আলি খান খানান। শর্মিলা ঠাকুরকে বম্বে থেকে এনে বসিয়ে দেওয়া হল পাশের সিংহাসনে। নতুন বাদশাহ পছন্দমত ঠিক করলেন একজন প্রধানমন্ত্রী। তিনি কর আদায় করেই খুশি। এখন নির্বাচন নেই, লোকসভা নেই, দারিদ্র্য নেই, দাঙ্গা নেই, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাব পর্যন্ত নেই।

অভিষেকের পর ওরা দু'জনে রাষ্ট্রপতি ভবন ছেড়ে চলে গেছেন লালকেল্লায়। সেখানেই অতঃপর হিন্দুস্থানের রাজাবাদশারা

থাকবেন। রাষ্ট্রপতি ভবন এখন সেভেন স্টার হোটেল, সংসদ ভবনে লুডো-ক্যারাম-তাসের কম্পেজিট ইনডোর স্টেডিয়াম, সুপ্রিমকোর্ট ভবনের ভিতরে বহু টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছে ক্রিকেটের নেট প্র্যাকটিসের ইনডোর পিচ। সেক্রেটারিয়েট নিয়ে কী করা যায়, তাই নিয়েই শুধু সমস্যা। তাছাড়া ভারতে এখন আর কোন সমস্যা নেই। আমাদের গণরাজতন্ত্র দারুণ চলছে।

॥ একুশ ॥

নিউজ এজেন্সির সামান্য একটি ভুলের জন্যে এত বড় একটা সংবাদ কলকাতার কাগজে ছাপা হল না। মাদার টেরেসার সঙ্গে আরও একজন ভারতীয়ও যে এবার চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, একথা ঠিক সময়ে এদেশের কেউ জানল না। বিদেশের সব কাগজ খুললে দেখতে পাবেন, ক্যানসারের ওষুধ

আবিষ্কর্তা ভুজঙ্গসুন্দর ঘোষকে নিয়ে কী হৈ-চৈ চলছে। এতদিন চেষ্টা করেও বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা যা পারেন নি, সাধারণ একজন বাঙালী তা পেরেছেন। এ কি কম আনন্দের কথা। কিন্তু এমনই কপাল, রয়টার এবং এসোসিয়েটেড প্রেস টেলিপ্রিণ্টারে যে নাম পাঠায় তাতে ভূজঙ্গসুন্দর ঘোষের নামের ইংরেজি বানানের আদ্যক্ষর তিনটি—বি, এস এবং জি বাদ পড়ে যায় এবং গোবেচারি বাঙালী ভদ্রলোকটি ইংরেজী উচ্চারণে হয়ে গেছেন হুজাঙ্গা উণ্ডার হোস। লোডশেডিংয়ের জন্যে খবরগুলো ঠিক মত আসছিল না। কার দেশ কোথায় জানা যাচ্ছিল না। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ওই নামটি পড়েই ধরে নেওয়া হয় নির্ঘাৎ জার্মান এবং ওইভাবেই এদেশের কাগজে খবরটি ছাপা হয়। তিনি যে বাঙালী তা প্রথম টের পাওয়া গেল বিদেশী টি ভি দলের অনবরত আনাগোনায়। নানা দেশ থেকে টেলিগ্রাম ও চিঠি আসছে, কিন্তু ঠিকানায় ভুল থাকায় সব চলে যাচ্ছে রিটার্ন লেটার অফিসে।

বিদেশের কাগজগুলি আসার পর অবশ্য কলকাতারও টনক নড়ল। তবে ভুজঙ্গসুন্দরবাবুর কোন পাত্তা নেই। রিপোর্টাররা গাড়ি ঘোড়া ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দিকে দিকে। অলিগলি শহরতলি তন্ন তন্ন খুঁজেও তাঁর হদিস কিন্তু মিলল না। ব্যাপারটা কী? ভোজবাজি নাকি? না, ভোজবাজি নয়, অবশেষে আমিই তাঁর সন্ধান পেয়েছি। কলকাতায় নয়, দিল্লি-বোম্বাইয়ে নয়, জলেঘেরা সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে। গোসাবা বাজার ছাড়িয়ে সুধন্যখালি ও সজনেখালির মাঝখানে গরান গাছের খুঁটিতে তৈরি যে কাঠের বাড়িটি জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে, সেখানেই একা থাকেন একালের বিস্ময় ভুজঙ্গসুন্দর ঘোষ। খালি গা, লম্বা দাড়িতে মাঝবয়সী ভদ্রলোক দুপুরের খাবারের জন্যে নদীর ধারের কেওড়া গাছে উঠে ফল পাড়ছিলেন, এমন সময় আমার স্পীডবোট ঘাটে এসে ভিড়ল। তিনি গাছ থেকে তখন নেমে পড়েছেন। এক হাতে রাইফেল এবং অন্য হাতে নোটবুক নিয়ে

আমি যখন তাঁর সামনে দাঁড়ালাম, তিনি তো হকচকিয়ে গেলেন। বাঘ আর কুমির দেখা চোখে একজন আস্ত মানুষের চেহারা তাঁর কাছে যেন বেখাপ্পা লাগল। আমার সংবাদসূত্র (তাঁর নাম উহ্য রাখাই বাঞ্ছনীয়) যেরকম স্থান ও চেহারার বিবরণ দিয়েছেন, তাতে এই ভদ্রলোক ভুজঙ্গসুন্দরবাবু না হয়ে যান না। আমি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে পরিচয় দিলাম এবং একটা ইন্টারভিউয়ের আবেদন জানালাম।

ভদ্রলোক আমাকে তাঁর লগ কেবিনের ভিতরে নিয়ে বসালেন, বললেন, 'বাঘ সাপের ভয় নেই এখানে, সব ব্যাটাকে বৃহৎ অট্টালিকাচূর্ণ খাইয়ে রেখেছি, এখন মানুষ মারতে ভয় পায়। ছিলুম বিরাটিতে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র পালিয়ে এসেছি এখানে। জানতাম লোকের ভিড়ে তিষ্ঠোতে পারব না। তাছাড়া আমি এমন কিছু করি নি, যার জন্যে এত মাতামাতি হবে।' ভদ্রলোককে বললাম, অনেক দূর থেকে ছুটে এসেছি। আমিই একমাত্র সাংবাদিক, যার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হল। যদি দয়া করে আপনার আবিষ্কারের মূল কথাটা সংক্ষেপে বলেন, তাহলে একটা দূর্দান্ত 'স্কুপ' হয়ে যায়।

ভদ্রলোক কচু গাছের ডাঁটা দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই সরল। আইনস্টাইন যাকে বলেছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স, সেটাই কুলকুণ্ডলিনীতে ধাক্কা মেরে তুতেনখামেন হয়ে গেছে। পত্রান্তরে আমারই 'উদ্ভট চিন্তা' প্রবন্ধে অনেক আগে বলেছি, আমরা ওপেনহাইমারের লিবিডো থিয়োরিকে যতই নস্যাৎ করি না কেন, স্বীকার করতেই হবে যে গাছেরও প্রাণ আছে। এমনকি এই কচু গাছেরও। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম সাইকোথেরাপিতে ক্যানসার রোগটাকে ধরব, কিন্তু এমার্জেন্সি নিয়ে এতই মাতামাতি হল যে ইকেবানা প্রথায় আকুপাংচার করা গেল না। তা' না যাক, দু'শ' মেগাওয়াট শর্টফল নিয়েও বাইজেনটাইন, আর্কিটেকচার বুড়ো আংলাকে কাৎ করে দিল। অবশ্যি এল বি ডবলিউয়ের

সঙ্গে ফসফরাস মিশিয়ে যে ফল পাওয়া গেল, তার চেয়ে বেশি ফল মিলল কচুরিকা ইণ্ডিকায়। সেই সঙ্গে একটু পুরানো ঘি চাই-ই চাই।'

দ্রুত লিখে নিয়ে আমি বললাম, "যা বললেন স্যার, জলের মত পরিষ্কার। কিন্তু স্যার, ওই কচুরিকা ইণ্ডিকা ব্যাপারটা—"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভুজঙ্গসুন্দরবাবু একটু হেসে বললেন, 'সেদিন কিসিঙ্গারও আমাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। অল্প কথায় বোঝাতে গেলে এইটুকুই শুধু বলব যে, কচুরিকা ইণ্ডিকা ইজ নট ওনলি এ এনসেফেলাইটিস, বাট অলসো এ সেমিকলোন। অর্থাৎ কিনা হাফ এ লীগ, হাফ এ লীগ অনওয়ার্ড। যাকে বলে কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই। এবার বুঝেছেন তো?

'বুঝেছি, কিন্তু কচুরিকা ইণ্ডিকা?'

'ধুৎতেরি। কচু মশাই, কচু। সনাতন গলা-চুলকোনো কচু।'

'তাই বলুন। এবার আর কিছু জানার নেই। সব বুঝে গেছি। অন্তত আড়াই কলম লিখতে পারব।'

'তা পারবেন, তবে আর একটু জেনে যান।'

'এত সরল ব্যাখ্যার পর আরো জানার আছে?'

'আছে আছে আছে'—ভদ্রলোক কান চুলকোনো অব্যাহত রেখে বললেন—'ক্যানসার রোগী আমার এক আত্মীয়ার কচুশাকে বড় আসক্তি। কী করে জানি না, বাড়ির রাঁধুনি ভুল করে সরষের তেলের বদলে একটু পুরোনো ঘি ঢেলে দেয় কচুশাক রান্নার সময়। খেয়ে বমি করলে কী হবে, পরদিন থেকে আত্মীয়ার সব কষ্ট দূর। সাত দিনের মধ্যে অল ক্লিয়ার। ডাক্তাররা দেখে অবাক। আরো জনা চারেককে পুরানো ঘিয়ে রান্না কচুশাক খাইয়ে একই ফল পেলাম। গোটা ব্যাপারটা ছাপিয়ে দিলাম 'বারাসত বার্তা' সাপ্তাহিকে। বিলেতের নেচার পত্রিকার সম্পাদক তাই পড়ে ছাপলেন নিজের পত্রিকায়।

তারপর হৈ হৈ ব্যাপার। নজর পড়ল নোবেল প্রাইজ কমিটির। আশী হাজার কোটি ডলার আমাকে দিয়ে একটা মার্কিন ওষুধ কোম্পানি পেটেন্ট নিয়েছে। তারপরের খবর তো আপনাদের জানা।'

আমি কলম থামিয়ে শেষ প্রশ্ন করলাম: 'এই টাকা আর নোবেল প্রাইজের টাকা কি আপনি কোন প্রতিষ্ঠানকে দান করছেন?'

'মাথা খারাপ'—ভুজঙ্গসুন্দর ঘোষের চটজলদি জবাব—'দানে-টানে আমি নেই। খাব-দাব ফুর্তি করব এবং বাঘের চাষ করব। সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। টাইগার প্রজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টরকে আমি একটা নতুন ফরমুলা দেব।'

আমি নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছি, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, 'ওই কচুশাকের কথা কিন্তু লিখবেন না। লিখলে আমি কনট্রাডিক্ট করব। থ্যাঙ্ক য়ু।'

কলকাতায় ফিরে আমার এই রিপোর্ট ছাপা হওয়া মাত্র আবার হৈ-চৈ। আবার পুরস্কার। আমিই প্রথম বাঙালী যে সৎ সাংবাদিকতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করার জন্য ফিলিপিন্স থেকে সেই জগদ্বিখ্যাত ইমেলদা প্রাইজ পেল। সম্বর্ধনাদির ভয়ে এবার আমারই সুন্দরবনে পালানোর পালা।

॥ বাইশ ॥

পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ভারত ছাড়া আর কেউ এখন ক্রিকেট খেলে না। অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশ রণে ভঙ্গ দিয়ে এখন শুধু ফুটবল টেনিস র‍্যাগবিতেই মেতে আছে। তার কারণ ক্রিকেটের নতুন নিয়ম। এল বি ডবলিউ'র নাম করে দীর্ঘকাল যে জোচ্চুরি চলছিল, তা তুলে দেওয়া

হয়েছে। রান আউট হিট উইকেট প্লেড অন ইত্যাদি অপরাধ আর নেই। বোল্ড এবং কট ছাড়া ক্রীজ থেকে ব্যাটসম্যানদের সরানোর কানুন নেই। ফলে বোলারদের বারোটা বেজে গেছে। মাথার ঘামে সারা মাঠ জলসিক্ত করে দিলেও ব্যাটসম্যানদের কাবু করা যায় না। ওঁরা দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। রান করারও দরকার নেই।

দরকার নেই এই জন্যে যে, কে কত রান করল, তা নিয়ে আজকাল আর কেউ মাথা ঘামায় না। ক্রিকেটে নতুন নিয়মে কে কত ঘণ্টা আউট না হয়ে ক্রিজে রইল, সেটাই বড় কথা, রানের হিসাবে নয়, সেঞ্চুরি হয় ঘণ্টা হিসাবে। তাছাড়া রানের দরকার নেই বলে এধার ওধার দৌড়ানোরও দরকার নেই। ওভার শেষ হলেই অন্য দিক থেকে অন্য বোলার বল করতে শুরু করেন, খেলার শেষে গোনা হয় মোট এগারজনে সময় নিল কত ঘণ্টা। যে দল বেশি সময় ক্রিজে থাকে, তারই জিত। সেই জন্যে পাঁচদিনের টেস্টও আর নেই। দুই ইনিংসে খেলার ব্যবস্থাও নেই। এখন প্রতি টেস্ট ম্যাচের সময় বেধে দেওয়া হয়েছে একুশ দিন। প্রতি তিন দিন অন্তর একদিন বিরতি। ফলে মোট সময় লাগে চার সপ্তাহ।

এই ঘণ্টা-মার্কা চার হপ্তার ক্রিকেট চালু হওয়ার পর প্রথমে সরে পড়ল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ওদের খেলোয়াড়রা এতই ধৈর্যহীন যে, ক্রীজে দাঁড়িয়ে মারার জন্যে কেবল ছটফট করে। ফলে আউট হয়। ১১২ ঘণ্টা বা ২০৮ ঘণ্টায় সেঞ্চুরি ডবল সেঞ্চুরি করতে পারে না। একে একে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকা নিউজিল্যাণ্ড, এমনকি পাকিস্তানও ক্রিকেটের মায়া ত্যাগ করে ভারতকে তাই একচ্ছত্র আধিপত্য দিয়ে দিয়েছে। এখন ভারত ক্রিকেটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তাছাড়া ক্রিকেট খেলে বাংলাদেশ, নেপাল, লাওস, কুয়ায়েৎ, মরিশাস, জর্ডান, সেনেগাল এবং সৌদি আরব। কিন্তু কেউই ভারতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি খেলোয়াড় যখন তখন ঘণ্টার সেঞ্চুরি করতে পারে। রান করার বালাই তো নেই, ঠুক ঠুক ঠেকিয়ে রাখলেই হল। ভারত প্রাচীন দেশ, ভারত সহিষ্ণু দেশ, ভারতের সঙ্গে অন্যরা পারবে কেন? আগেকার নিয়মে যখন দ্রুত রান তোলার কিংবা তড়িৎবেগে ছুটে বাউণ্ডারি আটকানোর কানুন ছিল, তখন বরং আমাদের অসুবিধে হচ্ছিল। এত ছটফটানি, এত চঞ্চলতা বেদ উপনিষদের দেশ ভারতের সনাতন ঐতিহ্যে খাপ খায় না। আমরা শীর্ষাসনে ৩১২ ঘণ্টা থাকতে পারি, আমরা হাত পা বেঁধে ৮৩৬ ঘণ্টা সাঁতার কাটতে পারি, আমরা ৫১২ ঘণ্টা মাটির তলায় থাকতে পারি। আমাদের সবই ঘণ্টার হিসাবে। তাই ক্রিকেটের এই ঘণ্টাকর্ণ চেহারা আমাদের চরিত্রের সঙ্গে বড় সুন্দর মানিয়েছে।

সেই সঙ্গে আরো কিছু কারণও আছে। টেস্ট একুশ দিনের হওয়াতে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেরা আর টেস্টে তেমন চান্স পাচ্ছে না। এত দিনের ধকল সইবে কে? তাই ভারতীয় ক্রিকেটের রঙ্গশালায় কোল ভীল সাওতাল মুণ্ডা নাগা মিজো মিশমিদের ধরে আনা হয়েছে। উপজাতি ও আদিবাসীরাই এখন আসর গরম করে রেখেছে। একুশ দিনের ধকল সহ্য করার ক্ষমতা একমাত্র ওদেরই আছে। পটাসকর ব্যানার্জি শর্মা ইত্যাদি পদবীধারী বাবুদের কয়েকজনকে রাখা হয়েছে খুট খুট ব্যাটধারী হিসাবে। বোলার সবাই আদিবাসী বা উপজাতি। অফ ব্রেক লেগ ব্রেক ইত্যাদি স্পিন বোলিংয়ের যুগ কবেই শেষ হয়ে গেছে। আঙুলে আঙুলে প্যাঁচ কষার ব্যাপারে ভারতীয় বাবুরা একদা কীর্তিমান ছিলেন, এখন শুধু ফাস্ট বোলিংই চালু থাকায় বস্তার ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল থেকে খেলোয়াড় ধরে আনতে হয়েছে। এদের দম অফুরন্ত, এদের টিপ অব্যর্থ, এদের শক্তি ভীমসমান। কোথায় লাগে হল-গিলক্রিস্ট, লিলি-টমসন। হাকাই মুর্মু কিংবা ভিজেটো অঙ্গামির কাছে কেউ

দাঁড়াতেই পারে না। বল তো নয়, এক একটি গোলা। আর একুশ দিন কেন, একশ একুশ দিনে এক হাজার ওভার বল করেও কেউ ক্লান্ত হয় না। আমাদের বাবু ব্যাটসম্যানরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রীজে দাঁড়িয়ে প্রতি খেলায় নিজের রেকর্ড নিজে ভাঙছেন, আর মুর্মু-অঙ্গামীরা বলের কামান দেগে শত্রুর শিবির চুরমার করছে। ভারতের সঙ্গে পারবে কে? বাংলাদেশ বা সেনেগাল তো এক পলকেই শেষ।

আর একটি পরিবর্তন ঘটে গেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। বম্বে বা দিল্লির টেস্টে দর্শকের ভিড় একেবারে কমে গেছে, কিন্তু কলকাতার মাঠে ভিড় ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। ইডেনে আর কুলোয় না। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের একটা চমৎকার স্টেডিয়াম বানানো হয়েছে। সেখানে সারা বছর ধরে নানারকম ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়। একুশ দিনের (বিরতি সহ মোট আটাশ দিনের) টেস্ট ম্যাচের টিকিট নিয়ে এখনও মারামারি চলে। রাইটার্সে কাজ নেই, খবরের কাগজে অন্য খবর নেই, ইস্কুল কলেজে ক্লাস নেই, কল-কারখানায় উৎপাদন নেই—সারা রাজ্য গোটা মাস স্টেডিয়ামে বসে থাকে। সব কাজকর্ম ভুলে এতদিন একনাগাড়ে মাঠে বসা থাকার ব্যাপারে বাঙালী সকলের শীর্ষে। দলে কোন বাঙালী অবশ্য খেলে না, তাতে কিছু যায় আসে না, একবার বীরভূমের একজন সাঁওতাল এবং অন্যবার কালিম্পংয়ের একজন নেপালী টেস্ট টিমে খেলেছিল, আমরা বাঙালীরা তাঁদের নিয়ে হৈ চৈ করেছি। আমরা কম কিসে? তবে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের খেলা দেখার ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও আগেকার মত টিকিট নিয়ে কালোবাজারি হয়। খেলার চার সপ্তাহ কলকাতার কোন বাড়িতে রান্নাবান্না হয় না। একমাত্র রোগী ও অথর্বদের ফেলে রেখে সবাই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের স্টেডিয়ামে পিকনিক করে। খেলার শেষে ডিনার-প্যাকেট নিয়ে সবাই বাড়ি ফেরে। কোনক্রমে রাতটা কাটিয়ে আবার মাঠে।

॥ তেইশ ॥

বাঙালী যে জগতের শীর্ষে, তা আবার প্রমাণিত হল। ইউরোপ-আমেরিকা অফিসে কারখানায় কাজের সময় কমানোর জন্যে নানা রকম আইনকানুন বানাচ্ছে, কিন্তু এখনও সপ্তাহে দু দিনের বেশি ছুটি দিতে পারছে না। আমরা কোন প্রকার আইন জারি না করেই এখন সপ্তাহে পাঁচ দিন ছুটি দেবার ব্যবস্থা করেছি।

এখন সারা পশ্চিম বাংলায় অফিস-কাছারি, কল-কারখানায় সপ্তাহে দু দিন মাত্র কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা—ব্যাঙ্ক বীমা ইত্যাদিতে আগেকার মতই দেড় দিন ছুটি চলছিল। কিন্তু এসপ্ল্যানেড ইস্ট এলাকায় আমরা এমন আন্দোলন শুরু করলাম যে, দিল্লি তার বিমাতৃসুলভ মনোভাব পরিত্যাগ করে রাজ্যের কর্মীদের সঙ্গে ছুটির সমতা দিতে বাধ্য হয়েছে। বেসরকারী অফিসগুলো প্রথমে গাইগুঁই করছিল। শেষে পাঁচ দিন ছুটির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। রেল এবং বিমান কোম্পানিতে ভাল ব্যবস্থাই করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় যারা কর্মরত, তাঁরা দেড় দিন ছুটি নিয়ে বাকি সাড়ে পাঁচ দিন কাজ করেন এবং তার মধ্যে সাড়ে তিন দিন ওভারটাইম পান। ফলে কার্যত তাঁরাও সপ্তাহে পাঁচ দিন ছুটি পেয়ে আসছেন। পশ্চিম বাংলা সীমান্ত রাজ্য বলে কেন্দ্র এই বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন এক বিশেষ আইন বলে।

সপ্তাহে মাত্র দু দিন কাজের ব্যবস্থা করতে বঙ্গবাসীকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয় নি। নানা রকম সর্বজনীন পুজোর ব্যবস্থা সারা বছর আমরা এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি যে, ছুটি না দিয়েও উপায় নেই। আগে হৈ-চৈ চলতো কেবল দুর্গা কালী সরস্বতী ও বিশ্বকর্মাকে নিয়ে। ক্রমে এলেন কার্তিক, এলেন জগদ্ধাত্রী। এখন এসে গেছেন গণেশ লক্ষ্মী ওলাবিবি শীতলা মনসা ইতু, টুসু বনবিবি ঘেঁটু সত্যনারায়ণ সন্তোষীমা নারদ ইত্যাদি ইত্যাদি। দুর্গাপূজা লক্ষ্মীপূজা আর কালীপূজার মাঝখানে এখন ফাঁক নেই। বিল্বষষ্ঠীর সাত দিন আগে যে উৎসবের শুরু, তার শেষ হয় ছটপরবের দিনে। ছটপরবও আজ বাঙালীর জাতীয় উৎসব। তারও সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী আছে। বার বার বিসজনের মিছিল করায় অনেক ঝামেলা আছে বিবেচনা করে পুলিস নির্দেশ দিয়েছে, দুর্গা কালী লক্ষ্মী জগদ্ধাত্রী কার্তিক সবাইকে এক সঙ্গে গঙ্গায় নিয়ে আসতে হবে। এই নিরঞ্জন উৎসব চলে আঠারো

দিন ধরে। আহিরীটোলার ঘাট থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত বিরাট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিমাগুলো প্ল্যাটফর্মে রেখে একে একে জলে ফেলা হয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে। তবে অন্যান্য সময় বিসর্জনের মিছিল নানা দিনে বছর/ভর বের হয়। প্রতি বছর কয়েক লাখ প্রতিমা গঙ্গায় পড়ে পড়ে তার বুক আরো উঁচু হয়ে গেছে। ফরাক্কা থেকে আরো বেশী জল ছেড়ে কিছুই হচ্ছে না। সরকার ভাবছেন অতঃপর বঙ্গোপসাগরে প্রতিমা বিসজনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

ওলাবিবি ঘেটু সন্তোষীমা প্রভৃতির পূজা বহুকাল ঘরের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সব কটি পূজাই আমাদের জাতীয় উৎসব। সব পূজাই বারোয়ারী। দু' সপ্তাহ তিন সপ্তাহ ধরে এক একটি পূজোর হৈ-চৈ চলে। তাছাড়া যেহেতু আমরা ধর্মনিরপেক্ষ, তাই ক্রিসমাস ইস্টার শবেবরাৎ বকরি-ঈদ বুদ্ধ-পূর্ণিমা নানকের জন্মদিন সাওতালদের বোঙা ইত্যাদির গুরুত্ব অবহেলা করি নি। এই সব অনুষ্ঠানেও সাত আট দিন আনন্দ করার ব্যবস্থা হয়েছে। শিবচতুর্দশী রথযাত্রা ঝুলনযাত্রা ইত্যাদি উপলক্ষে যেমন সরকারী ছুটির ব্যবস্থা আছে, তেমনি হরিউত্থান একাদশী গোবর্ধনপূজা সীতা নবমী রটন্তকালী অম্বুবাচী সাবিত্রীব্রত হাকাইষষ্ঠী ইত্যাদি নানা রকম ঐতিহ্যশালী যে সব ধর্মানুষ্ঠান এতদিন রাইটার্স বিল্ডিঙে অনাদৃত ছিল, আজ তার সব কটিই ছুটির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বারো মাসে তেরো পার্বণের উল্লেখ করে আমাদের পূর্বপুরুষরা গর্বিত হতেন, আজ বেঁচে থাকলে তাঁরা দেখতে পেতেন বারো মাসে তেরোশ পার্বণ নিয়ে বাঙালী জাতি সারা বছর কেমন আনন্দমুখর। পঞ্জিকা দেখে দেখে সব কটি পূজা বা অনুষ্ঠানের সময়সীমা এবং ছুটি সরকার এমনভাবে বেঁধে দিয়েছেন যে, পশ্চিম বাংলার কর্মজীবীকে বছরে মাত্র ১০২ দিন কাজ করতে হয়। তার থেকে প্রিভিলেজ লীভ ৪০ দিন, ক্যাজুয়েল লীভ ২০ দিন এবং মেডিকেল লীভ ৩৫ দিন বাদ দিলে হাতে থাকে সাত দিন।

এই সাতদিন কাজেই আমাদের হেসেখেলে চলে যায়। ক্রিকেটোৎ-সব থাকলে অবশ্য এমনিতেই আরো পাঁচ দিন বেসরকারী ছুটি মেলে। তখন কাজের জন্য মাত্র দু' দিনই যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, সরকার কড়া হুকুম দিয়েছেন, এর পরও যদি জনগণের কোন অসুবিধা হয়, তাহলে কোন সরকারী কর্মচারীকেই রেয়াৎ করা হবে না। মনে রাখতে হবে জনগণই শক্তির উৎস। তাঁরা যাতে সরকারের কাছ থেকে সময়মত এবং নিয়মমত কাজ পান, তার দিকে সকলেরই দৃষ্টি দিতে হবে। নইলে, নইলে···সরকারী কর্মচারীদের কোন একটি ইউনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করা হবে কী শাস্তি দেওয়া যায়। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে স্বৈরতন্ত্র মাথা চাড়া না দিয়ে ওঠে এবং সেই জন্যেই শুধু মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত না নিয়ে কোন একটি ইউনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ করাই এখন নীতি।

সম্বৎসরের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে চাঁদার পরিমাণ সরকারই ঠিক করে দিয়েছেন। ইতুপূজায় সাতাশ, ওলাবিবিতে আটত্রিশ, কালীপূজায় সাতান্ন—এই রকম আর কি। তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দু' হাজার টাকার কম মাইনে পান, এমন কর্মীদের জন্যে প্রতি মাসে চাঁদা-ভাতা দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক কর্মীকে থোক আড়াই শ টাকা করে দেওয়া হয়। তার জন্যে প্রতি মাসে দু' হাজার টাকার উপর বেশি রোজগার এমন লোকদের উপর বাড়তি একশ দশ টাকা চাঁদা-কর বসানো হয়েছে। তাতেও ঘাটতি পড়ায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী দিল্লির কাছে এক কড়া স্মারকলিপি পেশ করেছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, চাঁদা-ভাতার জন্যে যে টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হচ্ছে, তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ যদি কেন্দ্র না দেয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

তাছাড়া আরো কিছু সরকারী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেহেতু ওলাবিবি রটন্তকালী প্রভৃতি দেবীরা এখন সর্বজনীন, তাই

বারোয়ারী মণ্ডপ সরকারের খরচেই পাকাপাকিভাবে বিভিন্ন পাড়ায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার জন্যে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর ঋণ নেওয়া হয়েছে। প্রতি ওয়ার্ডে যাতে অন্তত এক হাজার বারোয়ারী মণ্ডপ থাকে, তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা আছে। এই বাবদ ডেকরেটারদের বিপুল ক্ষতি হওয়ায় তাঁদের সরকার মাসে মাসে ভরতুকি দিচ্ছেন। এই বাবদ এক হাজার টাকার উপর বেশি যাঁদের রোজগার, তাঁদের কাছ থেকে প্রতি বছর পাঁচ-শ টাকা করে মণ্ডপ-কর নেওয়া হচ্ছে। আর একটি বিষয় প্রশংসনীয়। পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রতি দিনই একটা না একটা বিসর্জন-মিছিল বের হওয়ার কথা। কিন্তু সরকারের ট্রাফিক পুলিস এতই বিবেচক যে, তারা সপ্তাহের মাত্র পাঁচ দিন সন্ধে ছ'টা থেকে রাত বারোটা সব রকমের গাড়ি-ঘোড়া চলাচল বন্ধ রেখেছেন। এখন পথে বেরিয়ে পূজার মিছিলে অযথা আটকা পড়ার আশঙ্কা নেই।

॥ চব্বিশ ॥

সারা পৃথিবীতে ধন্য-ধন্য পড়ে গেছে। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী —যিনি অবশ্যই বাঙালী—নতুন যে শিক্ষানীতি চালু করেছেন, তাতে শিক্ষান্তে চাকরি পাক আর না পাক প্রত্যেক ছাত্রই হয়ে উঠছে বৃহস্পতি চাণক্য অ্যারিস্টটলের সমাহার। এই তো সেদিন মন্ত্রীমশাই সংসদে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেছেন, 'চাকরির পায়ে

লাথি মারি। স্যার পি. সি. রায় প্রমুখ মনীষীরা বরাবরই চাকরির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এসেছেন। এতদিন যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, তাতে শুধু চাকরিই হয়েছে, বিদ্যার ব্যাপারে লবডংকা। তাই আমরা স্থির করেছি চাকরির তোয়াক্কা না করে এমন শিক্ষা দেব যে, ভারত আবার বৈদিক জ্ঞানযুগে ফিরে যাবে। যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র ভরদ্বাজ বশিষ্ঠের মত হয়ে উঠবে একালের ছাত্রসমাজ।' মন্ত্রীর বিবৃতির পর তোলপাড় হয়ে গেল আসমুদ্রহিমাচল। টেন প্লাস টু, না টুয়েলভ মাইনাস টু কিংবা ফাইভ ডিভাইডেড ইণ্টু থ্রি মাইনাস ফাইভ ইত্যাদি বিতর্কের জঙ্গলে আর প্রবেশ করার দরকার নেই, এখন সব সবল। বহুদিন আগে ছিল ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন। তারপর ফার্স্ট ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারাদি। এখন ওসব বালাই নেই। নতুন নতুন নাম। নাম না বলে সংকেত বলাই ভাল। যেমন ক্লাস থ্রি হল পয়েন্ট নাইন জিরো ফাইভ। ট্রানজিশন কে জি ইত্যাদিও কেউ বলে না, সেকেলে প্রথম মান দ্বিতীয় মান তো নয়ই—এখন ক্লাস ওয়ান হল পয়েন্ট জিরো জিরো এইট। ক্লাস টেন হল পয়েন্ট সিক্স এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস টুএবি। এতে অনেক সুবিধে হয়েছে, বিশেষ করে মা-বাবারা দারুণ খুশি। ছেলে ক্লাস সেভেনে পড়ে বললে পড়ার গুরুত্ব টের পাওয়া যায় না, পয়েন্ট থার্টিন পার্পেণ্ডি-কুলার বললে বোঝা যায়, হ্যাঁ পড়াশোনা করছে বটে।

ক্লাসের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সিলেবাস করা হয়েছে। আদ্যিকালের পাঠ্যসূচী বাতিল। পড়ার চাপটা নিচের ক্লাসে রেখে উপরের দিকে ধীরে ধীরে হালকা করে দেওয়া হয়েছে। কারণ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নতুন মেশিনে যেমন ভাল কাজ হয়, তেমনি নতুন কচি মাথায় বেশি বিদ্যে ধরানো যায়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন ভোঁতা হয়ে যায়, কাজ করে না। তাই যত কম বয়স, তত বেশি চাপ। এই ফরমূলা অনুযায়ী আজকাল ক্লাস থ্রি থুড়ি পয়েন্ট নাইন জিরো ফাইভে পড়ানো হয় থিয়োরি

অভ রিলেটিভিটি, বৈশেষিক দর্শন, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, ডিভাইনা কমেডিয়া, ডাস ক্যাপিটেল, মৃচ্ছকটিকম। ক্লাস ওয়ান থুড়ি পয়েন্ট জিরো জিরো এইটে লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অভ ইণ্ডিয়া রোমিও জুলিয়েট বলাকা তৈত্তিরীয় উপনিষদ ফাউস্ট মজ্ঝিম নিকায় দি রাইজ অ্যাণ্ড ফল অভ দি রোমান এম্পায়ার এবং চে গুয়েভারার আত্মজীবনী অবশ্যপাঠ্য। ঠিক তেমনি উপরের ক্লাসে আজ পড়ানো হয় স্পোর্টস অ্যাণ্ড স্ক্রীন ধ্রুবতারা স্টার অ্যাণ্ড লাইফ খেলার মজা ইত্যাদি পত্রিকা। সেইসঙ্গে থাকে বাংলা আধুনিক গান রচনাপদ্ধতি, সিনেমা নায়িকার জীবনী এবং না খেলার ক্রিকেট ইত্যাদি বই। সংস্কৃত তো অনেক আগেই উঠে গেছে, এখন স্কুলে উপরের ক্লাসে বাংলাও আর পড়ানো হয় না। আরে, মাতৃভাষা তো মায়ের কাছেই শেখা যায়, তার জন্যে আবার ক্লাসের সময় নষ্ট করা কেন। এখন সব ইংরেজি। সেইসঙ্গে জার্মান বা চীনা বা রাশিয়ান যেকোন আর একটি নিতেই হয়। বাংলাভাষা চর্চার শেষ নার্সারিতে। এখন নার্সারি পর্যায়ে চারটি ভাষা পড়তে হয়। মাতৃভাষা, হিন্দী, ইংরেজি এবং অন্য যেকোন বিদেশী ভাষা। নার্সারি পার হলেই মাতৃভাষা এবং হিন্দী বরবাদ।

পরীক্ষাপদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন আর গাদা গাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না। স্কুল কলেজ এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় যে যত কম সংখ্যক উত্তর দেবে, সে তত বেশি নম্বর পাবে। আগে যেমন বলা হত অন্তত ছটি প্রশ্নের উত্তর চাই, এখন প্রশ্নপত্রে বলা হয় দুটির বেশি উত্তর দিলে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবে। এই ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরি করার প্রস্তাব এসেছিল শিক্ষকসমাজের পক্ষ থেকে। তাঁদের বক্তব্য হল, সরকার থেকে প্রাইভেট টিউশনি (জনপ্রতি অন্তত পাঁচটি) আবশ্যিক করে দেওয়ায় পরীক্ষার খাতা দেখা কঠিন হয়ে পড়েছে। টিউশনি ছাড়াও বাজারহাট করা ক্রিকেট টেস্ট দেখা, ময়দানে জনসভায় যোগ

দেওয়া ইলেকশান খাটা ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া, মাঝে মাঝে ক্লাস করা ইত্যাদি নানা রকম প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে। তার মধ্যে আবার যদি গাদা গাদা খাতার গাদা গাদা উত্তরপত্র পড়তে হয়, তাহলে শিক্ষক হয়ে জন্মগ্রহণই যে বৃথা। সরকার প্রথমে খাতা দেখার রেট ডবল করে দিয়ে আপোসের চেষ্টা করে-ছিলেন। কিন্তু তাতে দুটি বছর ভালই চলেছিল। তারপর আবার আন্দোলন, আবার হুমকি। অবশেষে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিবলে নতুন ব্যবস্থা জারি হয়েছে। তাছাড়া আর একটি সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক হয়েছে। সরকার বলেছেন দশ পার্সেন্ট অবধি খাতা হারানো গ্রাহ্য। তার বেশি হলে কঠোর শাস্তি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের এগজামিনার পদ তখনই কেড়ে নেওয়া হবে কিনা তা বিবেচনা করার জন্যে বিষয়টি শিক্ষকদেরই তৈরি একটি কমিটিতে পাঠানো হবে। তাই এখন ট্রামে বা ট্রেনে কিংবা মুদির দোকানে পরীক্ষার খাতা পাওয়া গেলে মোটেই হৈ-চৈ হয় না। হেড এগজামিনার শুধু দেখেন খোয়া যাওয়া খাতা ওই টেন পার্সেন্টের মধ্যে পড়ল কিনা।

পরীক্ষার সময়ও সুন্দর ব্যবস্থা। গণটোকাটুকি ব্যাপারটাই আর নেই। এখন ওটাকে এমনভাবে ন্যাশনেলাইজ করে দেওয়া হয়েছে যে, 'হলের ভিতর ঢুকতে দাও, স্যাঙাতকে ঢুকতে দাও' ইত্যাদি স্লোগান আর শোনা যায় না। এখন প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সব বই দেওয়া হয়। উত্তর তো লিখতে হবে একটি কি দুটি, তার জন্যে যা যা বই দরকার সব সাপলাই দেন ইনভিজিলেটার। অনেকে অবশ্য বই দেখে লিখতে পারে না। সেই জন্যে নতুন নিয়মে প্রতি ঘণ্টায় তিনবার পরামর্শ করতে পারা যায় অন্য পরীক্ষার্থীর সঙ্গে। ছাত্রমহল খুশি। শিক্ষকমহল খুশি। সেই সঙ্গে অভিভাবকমহলও খুশি। পরীক্ষায় পাস ফেলের বালাই নেই। পাস করলেও যা, ফেল করলেও তাই। কারণ চাকরির সঙ্গে ডিগ্রির কোন সম্পর্ক আর নেই। বি-এ ডিগ্রি

পেলেই প্রত্যেককে চারশ টাকা বেকার-ভাতা দেওয়া হয়। এম-এ পাস করলে পাঁচশ টাকা এবং স্কুল ফাইন্যাল পাস করলে তিনশ টাকা। পেনসন গ্র্যাচুইটি এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থাও আছে। যারা শুধু চাকরি করতে চায়, তাদের জন্যে অবশ্য আলাদা ট্রেনিং স্কুল খোলা আছে। সেই স্কুলে ভরতি হতে গেলেও কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার দরকার নেই।

॥ পঁচিশ ॥

সি পি এম ইন্দিরা-কংগ্রেস এবং জনতাকে হারিয়ে আমি লোকসভার নির্বাচনে জিতেছি। প্রতিদ্বন্দ্বীদের জামানত জব্দ, আমি একাই পেয়ে গেছি পনের আনা ভোট। বাইশটি লটারি একসঙ্গে জিতে এই মুহূর্তে আমি সাতানব্বুই লক্ষ টাকার মালিক। এত পেয়েও আপশোস, আরও তিন লক্ষ টাকার

জন্যে। ঈস, তাহলে পুরো এক কোটি টাকা হয়ে যেত। চীন এখন ভারতের দখলে। আমি হুনান প্রদেশের রাজ্যপাল। পাকিস্তানকে ইনিংস ডিফিট দিয়ে এইমাত্র প্যাভিলিয়নে ফিরলাম। দুই ইনিংসে দুটি ডবল সেঞ্চুরি, বাইশ রানে উনিশটি উইকেট। স্লিপে দাঁড়িয়ে ক্যাচ নিয়েছি মোট তেরটি। এইমাত্র ঘোষণা হল আগামী অস্ট্রেলিয়া সফরে আমিই ক্যাপ্টেন। অজন্তার গুহায় দিনরাত আছি। প্রসাধনরতা রমণীর চারু মূর্তিখানি আমারই আঁকা। বার্ট্রাণ্ড রাসেল আর রমঁ্যা রঁলা—দুজনেরই মুখ চুন। পজিটিভ রিয়েলিজম সম্পর্কে এমন বক্তৃতা ঝাড়লাম, দুজনেই আমার নতুন দুটো বই আরো মন দিয়ে পড়ার জন্যে বাড়ি চলে গেলেন। উইলিয়ম দি কংকারার হৈ হৈ করে ইংল্যাণ্ডে ঢুকছেন। তরোয়াল—হাতে তাঁর পাশের লোকটি আমি। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা এসেছেন সিংহলে। তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি কলম্বো বন্দরে। লিখতে লিখতে চণ্ডীদাসের হাত ব্যথা। আমি তার কলমচি। 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' কবিতাটি আমার হাতেই লেখা। এরই জন্য চণ্ডীদাস নিয়ে এত গণ্ডগোল। মঙ্গলগ্রহে এইমাত্র এসে পৌঁছলাম। চমৎকার জল হাওয়া। জিনিসপত্রও ভীষণ শস্তা।

বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছি, এমন সময় এথেন্স থেকে এলাইতিসের টেলিগ্রাম। তার বক্তব্য, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কনগ্র্যাচুলেশনস। ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকল। গ্রীক কবি এলাইতিস এই তো সেদিন সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেল। আমার ছোটবেলাব বন্ধু। টেলিগ্রাম করেছিলাম অভিনন্দন জানিয়ে। হঠাৎ আবার কী এমন ঘটল যে, ও আমাকে পালটা অভিনন্দন জানাল? ব্যাপারটা বুঝলাম, স্টকহোম থেকে সুইডিশ একাডেমির এক বড়কর্তা আমার বাড়িতে আসার পর। তিনি বললেন, 'স্যার, কসুর হয়ে গেছে। এবারটির মত মাপ করে দিন। ভুল করে আমরা গ্রীসের এলাইতিসকে সাহিত্যের

নোবেল পুরস্কারটি দিয়ে ফেলেছি। আসলে ওটি আপনারই পাওয়ার কথা। আপনি জানেন না বোধ হয়, সব নোবেল প্রাইজই আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশমত দিই। এই যে পাকিস্তানের আবদুস সালাম এবার পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পেলেন,—বলুন তো কার সুপারিশে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সেপ্টেম্বরে সুপারিশ, অক্টোবরে ঘোষণা। আইনস্টাইন এলিয়ট চার্চিল কাওয়াবাতা মাদাম কুরী—সবাই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন আপনাদের এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই দৌলতে। রবীন্দ্রনাথ সি ভি রামন মাদার টেরিজা পাবেন—এতো জানা কথা, কিন্তু এ কথা তো জানেন না একটা নোবেল প্রাইজ আদায়ের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কী খোসামোদই না করতে হয়েছিল বার্নার্ড শ'কে।

আমার সব ভালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে অনুমান করে ওই সাহেব ভদ্রলোকটি অবশেষে বললেন, 'স্যার, আমি এইমাত্র এথেন্স হয়ে আসছি। এলাইতিসকে বললাম, ভাই কিছু মনে কর না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবার সাহিত্যের সুপারিশ দেরিতে আসতে এই গণ্ডগোল হল। তোমার টাকা আর পদক নিতে ডিসেম্বরে স্টকহোমে এস না। কলকাতা চায় মিস্টার চৌধুরীকে তার 'আজব ভাবনা' লেখার জন্যে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হোক। একাডেমির একটা এমার্জেন্সি মিটিং ডেকে আমরা সম্মতি জানিয়েছি। এখন তোমার সম্মতি পেলে ল্যাঠা চুকে যায়। এই দেখুন স্যার, এলাইতিসের সম্মতিপত্র। এবার আপনি দয়া করে পুরস্কারটি নিয়ে আমাদের সম্মানিত করুন। আপনি রাজি হলেই নিউজ এজেন্সিগুলোকে খবর দেব। ভেবেছিলাম এই প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স ডেকে ঘোষণা করব। কিন্তু আপনি সাংবাদিক বলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কোন কোন সংবাদপত্র না আসতে পেরে আন্দাজ করে ওটা বাতিল করেছি। এখন স্যার, আপনার কথা

পেলেই সব দিক রক্ষা হয়। আগামী ১০ ডিসেম্বর স্টকহোমে অনুষ্ঠান। প্লীজ আসবেন। এই রইল আসাযাওয়ার বিমান ভাড়া, হাত খরচ, ট্যাক্সি ভাড়া, হোটেল খরচ ইত্যাদি ইত্যাদি। যাক বাবা, বাঁচালেন। আপনি তাহলে রাজি। গুড নাইট। পি টি আই অফিস হয়ে দমদম চললাম। বাই বাই।

পরদিন সকাল থেকেই কেলেংকারি। আমার বাড়ি লোকে লোকারণ্য। ভোরবেলা রেডিওতে খবরটা শুনেই জনতা হাজির। টি ভি থেকে ছবি, রেডিও থেকে ইনটারভিউ। তাছাড়া এসেছেন শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, সাংবাদিক সংঘ, টালিগঞ্জ আড্ডাসংঘ ইত্যাদি থেকে প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারি। তারপরেই সাংবাদিকদের আক্রমণ। তার মধ্যে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্ন, এত ভাল ভাল লেখক থাকতে আমি কী করে এই পুরস্কার ম্যানেজ করলাম। নিশ্চয়ই ঘুসটুসের ব্যাপার আছে। আমি জবাবে বললাম, 'আপনারা যে এত সহজে ব্যাপারটা ধরে ফেলতে পেরেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ। হেম নবীন ডি এল রায় নোবেল প্রাইজ পেলেন না, পেলেন রবিঠাকুর। দেখুন, কী অবিচার, কী অন্যায়। তিনি দিয়েছিলেন দশ হাজার টাকা ঘুস, আমি দিয়েছি এক লাখ—হেঁ হেঁ হেঁ বুঝতেই পারছেন তো।' তারপর গণসম্বর্ধনা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সেই গ্রীক কবি এলাইতিস। আমার আজব ভাবনা লেখার খুব প্রশংসা করল, বলল 'একেই বলে সমাজসচেতনতা। এই আজব ভাবনা পড়ার জন্যেই যে সে যুগান্তর পত্রিকার গ্রীস-ডাক সংস্করণ নিত, তাও জানিয়ে দিল। প্রচুর হাততালির পর আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যাওয়ায় সভাভঙ্গ হল। আমিও বেঁচে গেলাম।

তার পরের দৃশ্যে দমদম থেকে লণ্ডন এসেছি। লণ্ডন থেকে স্টকহোম চলেছি। মাদার টেরিজা ও আবদুস সালামও আছেন একই প্লেনে। কোপেনহাগেন হয়ে যাওয়ার কথা। মাদার

টেরিজা তো বটেই, দেখলাম আবদুস সালামও যুগান্তরের নিয়মিত পাঠক। কলকাতার কথা জিগগেস করলেন, জানতে চাইলেন, ভাল নাটক কী কী চলছে এখন, তাঁর নামে রাস্তা হয়েছে কিনা, সায়ান্স কলেজ হকার মার্কেট হয়ে গেছে বলে যে খবর ডেইলি টেলিগ্রাফে বেরিয়েছে, তা সত্যি কিনা। নানা কথার পর ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম নিয়ে আমি যখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করছি, হঠাৎ প্লেনটা বেসামাল হয়ে গেল। ওলটপালট খেয়ে চরম দুর্ঘটনা ঘটে আর কি! আমরা দুর্গা আল্লা যীশুর নাম স্মরণ করছি, এমন সময় জানা গেল দোষটা পাইলটের। তিনি তন্ময় হয়ে আজব ভাবনা পড়তে পড়তে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন যে কোপেনহেগেন নামার মুখটায় ভুল বোতাম টিপে অনর্থ বাধিয়ে দিয়েছেন। জানা মাত্র ওকে সরিয়ে দিয়ে আমি পাইলটের আসনে বসলাম এবং সবাইকে নির্ঝঞ্ঝাটে স্টকহোমে নামালাম। তার পরের খবর তো আপনারা খবরের কাগজেই পড়ে নিয়েছেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

নিপীড়িত, বঞ্চিত বাঙালী অবশেষে তার গর্বের বস্তুটি হাতে পেল! ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই গৌরবময় যুগ এবং স্বাধীনতাপূর্ব বিংশ শতাব্দীর সেই সংগ্রামী ঐতিহ্য ইতিহাসের বিষয় হয়ে যাওয়ার পর বাঙালী হতমান নতমুখ হয়ে দিন কাটাচ্ছিল। তার সেই বিষণ্নবদন অন্ধকারে আবৃত রাখার জন্যে সরকার বহু মেহনত

করে লোডশেডিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। বাঙালী আর নোবেল প্রাইজ পায় না, পায় পাঞ্জাবীরা। মাদার টেরিজাকে দিয়ে সে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। বাঙালী আজ উচ্চতর শিক্ষার জন্যে ইংল্যাণ্ড জার্মানি না গিয়ে মহারাষ্ট্র হরিয়ানায় যায়। বাঙালী আজ বামাক্ষেপা সন্তদাস ছেড়ে ধরতে যায় তেলেগু বা গুজরাতী সাধু। সত্যজিৎ ও রবিশংকর নামক দুই ব্যাঙের আধুলিকে বার বার দেখিয়ে বাঙালী ক্লান্ত। চার্নকের শহর নেকলের শহর কলকাতাকে সবাই দুয়ো দেয়। কী লজ্জা, কী লজ্জা। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। কেউ যদি প্রশ্ন করে পৃথিবীর বৃহত্তম জাদুঘর কোথায়, তাহলে আমরা গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, কেন, এই তো আমাদের কলকাতা।

আহা, কী অপরূপ চিত্র। মূর্তিতে মূর্তিতে সব পার্ক সব রাস্তা ছেয়ে গিয়েছে। ছোট বড় মাঝারি—সব বাড়ি আজ সরকারের দখলে। বাসিন্দা বলতে যা বোঝায় কলকাতাতে কেউ নেই। পশ্চিম বাংলার রাজধানী এখন বর্ধমান। কলকাতার পথেঘাটে যে দু-চারজন ঘুরে বেড়ান, তাঁরা হয় টুরিস্ট, নয় কোন মিউজিয়ামের কিউরেটর। প্রায় ৪০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে যে কয়েক লাখ বাড়ি এত দিন রান্নাবান্না হাসি-কান্নায় মুখর ছিল, তার সবগুলিতেই এখন স্মৃতিচিহ্নের পাহাড়। গত হাজার বছরে প্রায় প্রতি ঘরেই দু-তিনজন মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্যে, পূর্বসূরীদের ঋণশোধের জন্যে আমরা পথেঘাটে তাঁদের মূর্তি বানিয়েছি, সকলের বাড়ি দখল করে নিয়ে সরকারী উদ্যোগে লাইব্রেরি গবেষণাগার বা জাদুঘর বানিয়ে দিয়েছি এবং আর কিছু না পারি অন্তত তাঁদের নামে রাস্তাঘাটের বা পার্কের নামকরণ করেছি। তবে রাস্তাঘাটের তুলনায় আমাদের এই সুপ্রাচীন বঙ্গদেশে মহাপুরুষের সংখ্যা এত বেশী যে, কুলোয় নি বলে লম্বা কোন রাস্তা পেলেই তাকে চার-পাঁচ ভাগ করে চার-পাঁচজন মনীষীকে পথে বসিয়ে দিয়েছি। সেই সঙ্গে মনীষীদের জন্মদিন

ও মৃত্যুদিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সরকার থেকেই অফিসে আদালতে ইস্কুলে কলেজে ছুটির ব্যবস্থা করেছি। আজ বাঙালী মুক্তপুরুষ। তাঁর কাজকর্ম নেই, লেখাপড়া নেই, মামলা-মোকদ্দমা নেই এবং কলকাতা শহরে থাকার বাড়িঘর পর্যন্ত নেই।

সরকারের হাতে বাড়ি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব আগে এলোমেলো-ভাবে আসত। যেমন কারো ঠাকুরদা হয়ত ছিলেন রাজনীতিগগনে একজন উজ্জ্বল তারকা। তাদের পৈতৃক বাড়ি সংস্কারের অভাবে পড়-পড়। ঠাকুরদার তিন নাতি তিনটি নতুন বাড়ি কেনার বন্দোবস্ত করে খবরের কাগজে প্রচার চালিয়ে এবং সরকারের কাছে ধরাধরি করে সেই জীর্ণ বাড়িটাকে ছয় লাখ টাকার সরকারী অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। ঢাকঢোল বাজিয়ে এবং কাগজে ছবি ছাপিয়ে হস্তান্তর হল। সরকার বললেন হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা। কিছু দিন বাদে সব অষ্টরম্ভা। মাঝখানে ওই ছয় লাখ টাকায় তিনখানা নতুন বাড়ি হয়ে গেল। কিংবা ধরুন কারো অপুত্রক ভাসুর বইয়ের প্রচুর রয়্যালটি এবং একখানা আগাছাঢাকা পৈতৃক ভিটা রেখে মারা গেলেন। আবেদন করা মাত্র সেই বরবাদ ভিটা সরকার মোটা টাকায় কিনে স্মৃতি মন্দির বানিয়ে দিলেন। রয়্যালটির টাকায় হাতই পড়ল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মনীষী অবশ্য নাজেহাল করে ছেড়েছেন আমাদের সদাশয় সরকারকে। তিনি প্রতিভাবান অমিতাচারী ছিলেন বলে ভাড়া ফাঁকি দিয়ে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় অন্তত বাষট্টিটা বাড়িতে ছিলেন। স্মৃতিপূত সেই সব বাড়ি সরকারকে দখল করতে হয়েছে। দখল করার পিছনে রয়েছে সংস্কৃতিবান বাঙালীর দাবি এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সরকারের ভালবাসা।

তাছাড়া বাংলায় এত সাহিত্যিক, এত অভিনেতা, এত খেলোয়াড়, এত রাজনীতিবিদ, এত বাগ্মী জন্মগ্রহণ করেছেন যে, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যে সে নিজেরই হোক বা ভাড়াই হোক তাদের বাড়িগুলো সরকারী দখলে রেখে

জাদুঘর করার বাসনা সত্যিই ঐতিহ্যবান বাঙালীর পক্ষে সম্ভব। সম্প্রতি আর এলোমেলোভাবে বাড়ি অধিগ্রহণ হয় নি। সরকার একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়ে এবং দেড়শজনের একটি গণতান্ত্রিক কমিটি গঠন করে চমৎকারভাবে বাড়ি দখল করেন। আজ কলকাতার দিকে তাকিয়ে দেখুন, প্রত্যেকটি বাড়ি স্মৃতিমন্দির, প্রত্যেকটি রাস্তা স্মৃতিসরণি। অতীতকে যে ভালবাসে না, তার ইতিহাসচেতনা নেই, পূর্বসূরীদের প্রতি যে সম্মান জানায় না, সে অর্বাচীন। আজ স্মৃতিপূত বাড়ি রাস্তা ও মূর্তিতে ছয়লাপ কলকাতা দেখে কেউ বলতে পারবে না আমরা অর্বাচীন, আমাদের ইতিহাসচেতনা নেই। একালের সমস্ত সজীব মানুষদের শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। একালের বাঙালীরা, বাধা বাঘা সব মনীষীর বংশধরেরা কলকাতার বাইরে এখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সেদিন দক্ষিণে টালিগঞ্জ এলাকার সর্বশেষ বাড়িটিও দখল করে নেওয়া হয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে এই বাড়িটির বাসিন্দা ছিলাম আমি। আমি নিজেই জানতাম না যে, আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা একজন মনীষী ছিলেন। কিন্তু আমি না জানলে কী হবে, এক গবেষক মুসলমান আমলের শেষ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করতে করতে জেনে গেছেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা নাকি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। কিসে বিখ্যাত, কেন বিখ্যাত, জানা যায় নি। তবে কোন একটি দলিলের পাদটীকায় ওই ভদ্রলোকের নাম থাকায় ধরে নেওয়া যেতে পারে, তিনি কিছু একটা ছিলেন। অতএব অতীতের গৌরব পতাকা আকাশে উড়িয়ে সেই সুবিখ্যাত বঙ্গ-সন্তানের স্মৃতিপূত বাড়িটি সরকার দখল করে নিয়েছেন। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা হয়ত বাড়ির মালিক ছিলেন। কিন্তু গত দুই পুরুষ থেকে মালিকানা বদল হওয়ায় আমরা ভাড়াটে। তাই এমনই কপাল, এত বড় একজন মনীষীর বংশধর হয়েও ক্ষতিপূরণের টাকায় নতুন বাড়ি কেনার বা ব্যাংকে টাকা জমা রাখার বা

ট্যাক্সি চড়ে দিনে চারশ টাকা খরচ করার সৌভাগ্য আমার হল না। সেদিনের হস্তান্তর অনুষ্ঠানের পরই বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে মাথা চাপড়াচ্ছি। কাকদ্বীপ বা বনগাঁর মত নতুন সৌখিন শহরে ভাড়া নেবার মুরোদ নেই। আসামে বা মেঘালয়ে আত্মীয়ের বাড়ি যাবারও উপায় নেই, গেলেই বিদেশী হয়ে যাব। তাই অন্য আরো দশজন বাঙালীর মত কলকাতার উপকণ্ঠে একটা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে চেষ্টা করছি আমারই ঠাকুরদার ঠাকুরদার স্মৃতিপূত সেই বাড়ির জাদুঘরে পাহারাদার বা গাইডের কোন চাকরি পাওয়া যায় কিনা। তবে একটি সমস্যা দেখা গিয়েছে। সরকার এখনও স্থির করে উঠতে পারেন নি এই বাড়িতে কী ধরনের জাদুঘর করা যায়। ঠিক তেমনই গবেষকরা এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি আমার পূর্বপুরুষ সেই মনীষী, কী ধরনের মনীষী ছিলেন। ইতিমধ্যে বাড়িটির তিন-চতুর্থাংশ ভেঙে পড়েছে। আমার জীর্ণ দেহের তিন-চতুর্থাংশও ভেঙে পড়েছে। একমাত্র সান্ত্বনা, জাদুঘর শহর কলকাতা আজ বিশ্বের বিস্ময়।

॥ সাতাশ ॥

বাঙালী এখনও অসাধ্য সাধন করতে পারে। তার প্রতিভা বরাবরই বিজ্ঞানমুখী। সাহিত্য সংগীত ইত্যাদিতে বাঙালীর পারদর্শিতা ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রচার করলেও বিজ্ঞানের অনুশীলনে সে বরাবর দিগ্বিজয়ী। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের নোবেল প্রাইজে সেই কবে পর পর দু'বার হ্যাটট্রিক করেছি আমরা। অবস্থা

এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, সুইডিশ একাডেমি বাঙালীদের রুখতে নতুন শর্ত আরোপের কথা ভেবেছিলেন। তবে আমরা শর্ত নিয়ে মাথা ঘামাই নি। পুকুরের মাছ আর মাঠের ধানের মত আমাদের ঘরে ঘরে ছিল নোবেল পুরস্কার।

তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর যুগান্তকারী আবিষ্কার কয়েকটি মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যজনোচিত বুদ্ধির সঞ্চার। কয়েক লক্ষ আরশোলা ছুঁচো টিকটিকি এবং নেংটি ইঁদুরের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা যায় যে নানা কাজে এরা মানুষের চেয়েও বেশি পারদর্শী। আরশোলারা অধ্যাপনায়, ছুঁচোরা রাজনীতিতে, টিকটিকিরা পুলিশের কাজে এবং নেংটি ইঁদুরেরা চলচ্চিত্র পরিচালনায় অতীতের সব বাঘা বাঘা মানুষকে টেক্কা দিয়েছে। নানা রকম ঔষধ ও ইনজেকশন গত তিনশ' বছর ধরে ওদের শরীরে চালনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দৈহিক ক্রমবিবর্তনে এরা কথা বলতে পারে, হাঁটতে পারে এবং ভাবতেও পারে। চলচ্চিত্র জগতে অবশ্য নেংটি ইঁদুর ছাড়াও আরো কিছু চতুষ্পদ প্রাণী তাদের দুটি পদ বিলুপ্ত করে দিয়ে অসাধারণ মেধার পরিচয় দিচ্ছে। আজকাল বাংলা সিনেমা দেখতে যে এত ভীড়, তার কারণ একদা-মনুষ্যেতর এই সব প্রাণীর আবির্ভাব। এমন একদিন ছিল যখন খাস কলকাতা শহরে সবাই হিন্দী সিনেমা দেখত, হিন্দী গান গাইত এবং 'হিন্দী চলবে না চলবে না' বলে চেঁচাত। কিন্তু সেদিন আর নেই, বাংলা সিনেমা নিউ থিয়েটার্স ও সত্যজিৎ রায়ের স্বর্ণযুগকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। আগে যুক্তি, সম্ভাব্যতা, মাধুর্য, চাতুর্য ইত্যাদি নানা ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো হত, শিল্পসম্মত হল কিনা, তাই নিয়ে পরিচালক প্রযোজকের ভাবনা চিন্তা ছিল, এখন তুচ্ছ এসব জিনিসের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছে বাংলা সিনেমা।

আসলে অ্যাবসার্ড ড্রামা নামক বস্তুটি নাট্যজগতে বেশ বাহবা পাচ্ছিল, সেই বাহবার লেজ ধরতে সিনেমা পরিচালকরা অ্যাবসার্ড

ফিল্মের সৃষ্টি করেছেন। নেংটি ইঁদুররা তাদের আদিকালে এমনিতেই ছিল বুদ্ধিমান, ইদানীং দৈহিক ও মানসিক বিবর্তনের পর তাদের বুদ্ধি আরো খুলে গিয়েছে। যাঁরা অভিনয় করেন, যাঁরা ছবি তোলেন, শব্দগ্রহণ করেন এবং গান প্লেব্যাক ইত্যাদি করেন, সবাই সেই আদি নেংটির বংশধর। অন্ততঃ সাতাশটি মৃত্যু, আটত্রিশজন যক্ষ্মা রোগী, পাঁচটি দুর্ঘটনা চিত্রনাট্যে থাকেই। বাংলা সিনেমা দেখতেও নেংটি ইঁদুররা যায়। হাসির সংলাপ শুনে হাপুস নয়নে কাঁদে এবং প্রেমের দৃশ্যে হেসে গড়িয়ে পড়ে। এই হাসিকান্নার আশ্চর্য প্রয়োগ পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। বোম্বাই টোকিও হলিউডের স্টুডিওগুলো এখন গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়ে বাংলা অ্যাবসার্ড ফিল্মের জয়জয়কার।

এই ফিল্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য গান। যে-কোন মাঝি চরিত্রই সংগীত বিশারদ। তারা যখন তখন কারণে অকারণে 'বন্ধুরে' বলে চেঁচায়। তাছাড়া রবিবাবুর টপ্পা খুব চালু। বহু বছর আগে রবীন্দ্র সংগীত নামে একটা বস্তু ছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকটায়। কে কত ঢিমেতালে গাইতে পারে তাই নিয়ে গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে কম্পিটিশান ছিল। কেউ আপত্তি করলে বলা হত, 'আমি অমুক দাদা আর অমুক দিদির কাছে শিখেছি।' বলা বাহুল্য, সেই সব দাদা-দিদিরা ইহলোকের মায়া আগেই ত্যাগ করায় সন্দেহ নিরসনের কোন সুযোগ ছিল না। ১৯৯১ সালের পর রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার উপর বিশ্বভারতীর কর্তৃস্বত্ব চলে যাওয়ায় সুরের বিকৃতি নিয়ে আপত্তি তোলারও আর কেউ নেই। আগেকার সেই ঢিমেলয় ঢিমেতর হতে হতে এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, রবীন্দ্রনাথের একখানা গান গাইতে এল পি'র পুরো এক পিঠ লেগে যায়। খর বায়ু বয় বেগে কিংবা এলেম নতুন দেশে পর্যন্ত বিলম্বিত লয়ের গান। সেই সঙ্গে টপ্পার দানার নাম করে গলা-কাঁপুনি ঢোকানোর

স্টাইলটা পপুলার হয়ে যাওয়ায় এক একটি লাইন গাইতেই দু-তিন মিনিট লাগে। গাওয়ার ধরন ও সুর একেবারে পালটে যাওয়াতেই আগে যেমন আসরে চলত নিধুবাবুর টপ্পা, এখন সিনেমায় চলে রবিবাবুর টপ্পা। স্বরবিতান নামধারী পুস্তক-গুলি নিখিল এশিয়া রবীন্দ্রপ্রেমী সমিতি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডেকে পুড়িয়ে ফেলেছেন। এখন সুর লয় তাল ইত্যাদি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঘুমপাড়ানি বিলম্বিত হলেই হল। রবি ঠাকুরের টপ্পার ঠেলায় আধুনিক বাংলা গান উঠেই গেছে।

উঠে গেছে আরো অনেক কিছুই। বাঙালী জীবন থেকে লেখাপড়ার পাট গেছে, বেকারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে চাকরির পাটও নেই। বাঙালী এখন সব ছেড়েছুড়ে দুটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমরা এখন বছরভর বারোয়ারী পূজো করছি এবং দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিক্ষোভ মিছিল বের করছি। আর আছেন, আগেই বলেছি অল্প কিছু বিজ্ঞানী—যাঁরা নানা রকম কায়দা কানুন করে মনুষ্যেতর প্রাণীর উন্নতি ঘটিয়ে চলেছেন। শোনা যায় রাজশেখর বসু নামে এক ভদ্রলোক গামা-রশ্মির সাহায্যে ইঁদুর জাতিকে 'গামানুষ' বানিয়েছিলেন। একালের বিজ্ঞানীরা সেই একই পদ্ধতি নিয়েছেন কিনা জানি না, তবে এই ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে পশ্চিমবঙ্গ নামক ভূখণ্ডের যাবতীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মের ভার এইসব নবসৃষ্ট প্রাণীর উপর। এঁরা যে অন্যান্য সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, তা নানা ক্ষেত্রে বার বার প্রমাণ হয়ে গেছে।

অবশ্য আদি মানুষেরা আদৌ লোপ পায় নি। তারাও পাশাপাশি আছেন। তবে অন্য প্রাণীদের সংখ্যা এত বাড়ছে এবং তাঁরা যেভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পে বিচিত্র প্রতিভার নব নব পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে আশঙ্কা হয় আদি

মানবেরা অচিরেই হারিয়ে যাবেন। পূজার মিছিল আর বিক্ষোভ মিছিল বের করার লোকই হয়ত পাওয়া যাবে না। তখন হয়ত সে ভারও নিতে হবে নরসৃষ্ট সেইসব উন্নততর প্রাণীকে। কিংবা হয়ত আরও দশটা ভাল জিনিসের মত বাঙালীর মিছিল ঐতিহ্যও লোপ পেয়ে যাবে। তখন উপায়?

॥ আঠাশ ॥

পরপর দুটি ঘটনা ভারতের চেহারা একেবারে পাল্টে দিয়েছে। ভৌগোলিক এক বৃহৎ দুর্ঘটনায় পশ্চিম এশিয়ার ভূগর্ভে লুকানো যাবতীয় তেল সরে এসেছে ভারত ভূখণ্ডে। ইরান কুয়াতেৎ ও সৌদি আরবে এক নাগাড়ে সাতদিন ভূমিকম্প চলার পর সেকালের তেল-রাজ্যের সব ওলটপালট হয়ে গেছে। বাড়িঘর তেলের পাইপ

ও শোধনাগারগুলো ভেঙ্গে চুরমার তো হয়ে গেছেই, ভেতরের তোলপাড় কাণ্ডে তেলের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার পূর্ববাহিনী নদী হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশকে তৈলাক্ত করে দিয়েছে। চতুর্থ মহাযুদ্ধের পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বলে অবশ্য আলাদা কোন রাষ্ট্র আর নেই, এখন সব আগেকার মত ইণ্ডিয়া হ্যাট ইজ ভারত। ইরান ইরাক সৌদি আরব ইত্যাদি দেশগুলোর অবস্থা এখন বড়ই কাহিল। আবার সেই উট, আবার সেই মরুভূমি। তেলের দৌলতে চোখ রাঙ্গানো আর নেই, গাঁটের কড়িতেও টান, তার বদলে তেল সাগরে ভাসন্ত ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ শুধু নয়, ভারতের ইশারায় গোটা পৃথিবী ওঠে আর বসে। পৃথিবীর যাবতীয় তেলের শতকরা ৮০ ভাগ এখন আমাদের দখলে। তেলের বিকল্প বের করার জন্যে জার্মানি, জাপান ও আমেরিকায় চেষ্টা চলেছে গত একশ বছর ধরে, কিন্তু কোন ফল হয় নি, তেলের কদর রয়েছে আগেকার মতই। নেপালের একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী বিকল্প-প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ব্যাপারটা জানতে পেরে ভারত সরকার ভদ্রলোককে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন না। সব টাকা ব্যাংকে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে কাশীর বাতানুকূল বিশ্বনাথ মন্দিরে রোজ জপতপ করেন। ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ কেটে কিছু তেল গোপনে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল আফগানিস্থান। কিন্তু আমাদের গোয়েন্দারা তা আগেভাগে জানতে পারায় দিল্লি কাবুলকে হাঙ্কাগোছের এমন একখানা ধমক দেয় যে, আফগানিস্থানের বৌদ্ধ নৃপতি মহাথের সাদিক বর্ধন দু কান মলে বললেন 'গোস্তাকি মাফ করুন হুজুর।' তেলপাচারের ঘটনার এইখানেই ইতি।

ভারতের এই যে রবরবা, এই যে তেলের গরমাই, তা কিন্তু হালের। এই কিছুদিন আগেও আমাদের ছিল আচ্ছোভক্ষ ধনুর্গুণো অবস্থা। দিন মজুর বেকার ভিখিরি মুটে ইত্যাদিদের

বোনাস দিয়ে দিয়ে এবং নাসিক থেকে নোট ছাপিয়ে ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতি এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে বাজারে যেতে হচ্ছিল টাকার থলি নিয়ে এবং বাজার আনছিলাম পাঞ্জাবির বুক পকেটে। আলু দেড়শ টাকা কিলো, সরষের তেল সাতশ টাকা কেজি, মৌরালা মাছ এগার শ' টাকা হাফ কেজি। এই রকম আর কি। রিভার্ভ ব্যাংকে জমানো সোনা থাকলে না হয় কথা ছিল। সেগুলো অনেক দিন আগে জনতা নামধারী এক অসামান্য সরকার নীলামে ফুঁকে দিয়েছে। সারা দেশ যখন টাকার নোটে ছেয়ে গেছে, ঠিক তখনই নতুন সরকারের নজরে পড়ল আমাদের মহিলার গায়ের সোনার উপর। অর্থমন্ত্রী সোনাচাঁদ মুর্মু ঘোষণা করলেন, 'আমাদের অসমাপ্ত পঞ্চবার্ষিক যোজনা সম্পূর্ণ করতে মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেই করে জওহরলালজী দুটো যোজনা হাঁসিল করেছিলেন, তারপরই সব এলোমেলো, যে টাকা সরকারের ঘরে আসে, তার সত্তর ভাগ চলে যায় বোনাস বেকারভাতা ও বেতনে। বাকি তিরিশ ভাগ যায় বিদেশী দূতাবাস সামলাতে এবং মন্ত্রীদের বিদেশ সফরে। কারখানা বানাবার, চাষ বাড়াবার টাকা কোথায়? বছর বছর যে ভোট হয়, তার জন্যে টাকা ধার করতে হয় বিশ্বব্যাংক থেকে। এইভাবে তো চলতে পারে না। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা সেরেই লেগে গেলেন কাজে। প্রথমে হাত দিলেন মেয়েদের নাকে। সোনার নোলক আর নাকছাবি জমা হল আট কোটি ভরি। তাই দিয়ে তৈরী হল তিনটি নতুন ইস্পাত কারখানা। নাকের পর কান। কান থেকে ষাট কোটি ভরি। সেই সোনায় বানানো হল নতুন রাস্তা, নতুন পুল, নতুন রেল। নাক-কানের পর গলা। গলার সোনায় বোনাস দেওয়া হল আমাদের সৈন্যবাহিনীকে। হাতের সোনায় জোগানো হল সরকারী কর্মীদের ওভারটাইমের খরচ। হাতের আংটি পায়ের মল নিয়েও যখন টাল সামলানো গেল না, তখন দেবমন্দিরগুলোর সোনায় টান দিলেন সরকার। অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স। বোনাস আর ওভারটাইমের টাকার

উপর মহার্ঘভাতা ধরার দাবি যখন জোরালো হল, সরকার আগ বাড়িয়ে সেই দাবি মেনে নিলেন এবং তেরটা মন্দিরের জমানো সোনা বেচে সমস্যার সমাধান করলেন। নিরলংকার মহিলারা নতুন ফ্যাশান বের করে আবার পুরুষদের মনোযোগ আকর্ষণে উদ্যোগী হলেন। দেশের সব সোনা ইতিমধ্যে ফাঁক। জিনিস-পত্রের দাম আকাশছোঁয়া। সরকার আসে আর যায়। অর্থনীতির চরম দুরবস্থায় চারদিকে হায়-হায় রব। সংসারের শেষ সম্বল সোনাদানা। অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকার গা এবং লকার থেকে সব সোনা কেড়ে নেওয়ার পর সোনা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। সোনা বেচে সংসার চালানোর প্রশ্নও তাই ওঠে না। আসমুদ্র-হিমাচল এইভাবে দেনার দায়ে যখন বিকিয়ে যাবার জোগাড় সেই সময়ই জয় মা কালী জয় বাবা বিশ্বনাথ, সনাতন ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিল পশ্চিম এশিয়ার ভূমিকম্প এবং তৈলধারার পূর্ববাহিনী স্রোত।

আগেই বলেছি, এখন দেশের অন্য চেহারা। পৃথিবীর অর্থনীতি এবং তৎসঙ্গে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে ভারতবর্ষ। রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর এখন বিলাসপুরে, ইউনেস্কোর সদর দুমকায় এবং বিশ্বব্যাংকের সদর শিবকাশীতে। আমরা বছর বছর তেলের দাম বাড়াই আর নতুন নতুন এটম বোমা বানাই। হিন্দুধর্ম প্রচার সমিতি এখন সুইজারল্যাণ্ড বা আর্জেন্টিনায় গিয়ে 'ক্যু অর্গেনাইজ করে। হিন্দু মিশনারিরা আয়ার্ল্যাণ্ড বা মঙ্গোলিয়ায় গিয়ে ধর্ম প্রচারের নামে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ঝগড়া বাধায়। রাশিয়া বা আমেরিকার নির্বাচনে টাকা ঢালে। ক্রেমলিনে কে ক্ষমতার আসনে বসবেন তাই নিয়ে মাথা ঘামায়। অর্থাৎ টাকার জোরে অন্য সব দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলায়। ভারত প্রশান্ত আটলান্টিক—তিন মহা-সাগরে আমাদের যুদ্ধজাহাজ টহল দিয়ে বেড়ায়। এতো গেল বাইরের অবস্থা, দেশের ভিতরেও জমজমাট চেহারা। সৌরাষ্ট্র থেকে সুন্দরবন—আমাদের উপকূল জুড়ে একের পর এক বিশাল

রিফাইনারি। ব্যারেল ব্যারেল তেল উপচে উঠছে আর তা শোধন করে বোঝাই করা হচ্ছে ট্যাংকারে। গোয়ার কাছাকাছি কতকগুলো জায়গা আছে যেখানে কুয়ো খোঁড়া যায় না, টিউবওয়েল বসানো যায় না, মাটি একটু খুঁড়লেই গলগল করে তেল বেরিয়ে আসে। এমনই অবস্থা, তেলের ভয়ে কেউ মাটিতে আলপিন পর্যন্ত ফোটায় না। দেশের সবাই শিক্ষিত, গড়পড়তা আয় সর্বাধিক এবং বাঁচার গড়বয়স সাতানব্বুই। তেল দিয়ে কেনা টাকায় সব মেয়েদের সোনার গয়নায় আপাদমস্তক সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মন্দিরে মন্দিরে সোনা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে ডবল। চারদিকে সুখশান্তি সমৃদ্ধির ছলাকলা। রাস্তাঘাট বাড়িঘর পায় সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়ার অবস্থা।

তার মধ্যে একমাত্র কলকাতা শহরই ব্যতিক্রম। অতীতে আমরা কেমন ছিলাম, তা দেখানোর জন্যে এই একটি মাত্র শহরকে অনেক টাকা খরচ করে আগেকার মত সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দূর দূর জায়গা থেকে জঞ্জাল এনে রাস্তার মোড়ে সাজিয়ে রেখেছেন সরকার। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে ঘেরাও ধর্মঘট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যখন তখন লোডশেডিং জিইয়ে রাখা হয়। নতুন বাস কিনে এনে মরচে ধরানো হয়, অচল করা হয় এবং বাসে গাদাগাদা লোক ঢুকিয়ে টুরিস্টদের আকর্ষণ করা হয়। বহু কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে অনেক কষ্টে তৈরি করা বস্তিতে লোক রাখা হয়েছে কলকাতার চারধারে। টাকার পাহাড় জমতে জমতে এমন অবস্থা যে, কিছু খরচ করার জন্যে এখন প্রতি মাসে নির্বাচনের ব্যবস্থা, বছরে অন্তত বারোটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বম্বে দিল্লি মাদ্রাজ ব্যাঙ্গালোরকে রেহাই দিয়ে একমাত্র কলকাতা শহরেই আলকাতরা ও রং দিয়ে দেয়ালে দেয়ালে, বাড়ির গায়ে গায়ে ভোটের শ্লোগান লেখার ব্যবস্থা আছে। রসগোল্লা জেলেপাড়ার সং লোডশেডিং ও বাঁকুড়ার ঘোড়ার মত আলকাতরায় দেয়াল নোংরা করা বাঙ্গালী ঐতিহ্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, কিছু বাঙ্গালী বুদ্ধি-

জীবীর আবেদনক্রমেই ভারত সরকার দেয়ালে বাড়িতে আলকাতরার ছবি ও অক্ষর ব্যবহারের বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন। কলকাতা এখনও ভারতের গর্ব, পৃথিবীর গর্ব। তেলের টাকায় বিলাসের ছড়াছড়ি, তবু বাঙ্গালী তার অতীত ভোলে নাই। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, তামিলনাডু অতীতকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু করেছে, কিন্তু আমাদের বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে বস্তি ভিড় আলকাতরা লোডশেডিং জঞ্জাল ইত্যাদি নিয়ে বাংলার অতীত জ্বলজ্যান্ত বর্তমান হয়ে আছে। সেই কারণেই আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরাতত্ত্ববিদরা ভিড় করছেন দুটি মাত্র জায়গায়— মহেঞ্জদারো এবং কলকাতায়। সেই কারণেই দূর অতীতের এক বাঙ্গালী কবি উদাত্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি।' বাঙ্গালী তোমার তুলনা তুমিই।

॥ উনত্রিশ ॥

নারী বর্ষ গেল শিশু বর্ষ গেল, এবারে কী? যারা জানেন না, তাঁদের অবগতির জন্যে জানাই, আগামী বছরটি আন্তর্জাতিক শালী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমে ঠিক ছিল, আর বর্ষটর্ষ নয়, দশক ধরে নাম জোড়া হোক। যেমন নারী দশক শিশু দশক ইত্যাদি। ঠিক তেমনি পুরো আশীর দশকটা শালীদের

নামে উৎসর্গ করার জোরালো প্রস্তাব ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল, কিন্তু ইরান, সেনেগাল ও মঙ্গোলিয়া থেকে এমন আপত্তি ওঠে যে শালী দশক না বলে এই ১৯৮০ সালকে শালীবর্ষ হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে। কোন কোন দেশ আবার সংশোধনী প্রস্তাব এনে বলে ইণ্ডিয়ান হিণ্ডুদের যত বায়নাক্কা। আরে, শালী বলে কোন আলাদা পদার্থ আছে নাকি? সহোদরা না হলেই হল, আজ যিনি বোন কাল তিনি শালী। আজ যিনি শালী কাল তিনি স্ত্রী। আজ যিনি স্ত্রী, কাল তিনি আবার শালী। শালী নামে কোন সঠিক জান্তব পদার্থ নেই। ঘটনাবিশেষে তার চরিত্রের রূপান্তর ঘটে। অতএব শালীবর্ষটর্ষ বাদ দাও, বরং কাজিন-ইয়ার নাম দাও, চুটিয়ে কাজিনদের বিয়ে করতে পারবে।

এই সব কথাবার্তা শুনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি মিঃ সনাতন শালীগ্রামী ভীষণ বিরক্ত হয়ে এক আবেগকম্পিত ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'মাসতুতো পিসতুতো বোনদের নিয়ে ফাজলামো আমরা সহ্য করব না। ভারতের প্রস্তাব নাকচ হলে আমেরিকার দরিয়ায় আমাদের টুয়েন্টি সেভেন্‌থ্‌ ফ্লিট পাঠানো হবে, রুশ দূতদের কে জি বির চর বলে বন্দী করে রাখা হবে, ফরাসী দূতাবাস পুড়িয়ে দেওয়া হবে। আমরা শান্তিবাদী লোক কিন্তু শালীদের দাবী নাকচ হলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাড়িতে এটম বোমা ছাড়তে কসুর করব না। পাকিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ কিসমৎ খাঁ সাদী হঠাৎ টেবিল চাপড়ে ভারতের জঙ্গী মনোভাবের প্রতিবাদ জানাতে উঠলে সনাতন শালীগ্রামীর বাঁজখাই গলাও সপ্তমে উঠল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'শালীদের দাবি না মানলে ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। শালীদশক না হোক অন্তত শালীবর্ষ হোক'। ভোটাভুটি হল। কিন্তু গোনার সময় এমন মারামারি হল যে, বিষয়টি পাঠানো হল নিরাপত্তা পরিষদে। পরিষদের স্থায়ী সদস্য ফিজি ভিটো প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেওয়াল যে, কাজিন-ইয়ার টিয়ার নয়, ১৯৮০ সাল আন্তর্জাতিক শালীবর্ষই হবে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের এই প্রস্তাব সর্বসম্মত হওয়াতে উল্লসিত মিঃ শালীগ্রামীকে দিল্লি ফেরার পথে মরিশাসে বিপুল সম্বধনা দেওয়া হল। সেই সম্বর্ধনা সভায় তিনি বললেন, শালীদের জয় ভারতকে আবার পৃথিবীর উচ্চ মঞ্চে বসিয়েছে। আমরা যে সেই বিখ্যাত রাজা শালীবাহনের যোগ্য বংশধর, তা প্রমাণিত হল। ভারত এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম উত্তরাধিকারী শ্রীলংকা— এই দুটি রাষ্ট্রই প্রধানমন্ত্রী রূপে নারীকে বসিয়েছে। এই নারীরা কুটুম্বিতাসূত্রে কারও না কারও শালী। বঙ্গাল মুলুকে শালীদের কত আদর। তাদের লোকগাথায় বলা হয়েছে, বিন্নি ধানের খই এবং শালী ধানের চিঁড়া। শালীদের হাতে কোটা ধানের চিড়া যে কত উপাদেয় তা আমি একবার কলকাতায় গিয়ে টের পেয়েছি। আমাদের ভাষায় ভদ্রতা ও সুরুচির প্রতিশব্দ শালীনতা। তার মুল অথ হল শালাদের প্রতি ভদ্র আচরণ। শালী থাকলেই বল, শালী থাকলেই ধন, তাই আমরা বলে থাকি বলশালী এবং ধনশালী। আর কা বলব ভাইয়োঁ আউর শালীয়োঁ, এই আশী সালটা খুব ভাল করে শালীদের খিদমত করবেন। তাতেই হনুমানজী খুব খুশী হবেন। নারী এবং শিশুদের নিয়ে ভারত মাতামাতি পছন্দ করে না। নারীরা অর্বাচান, শিশুরা বালখিল্য। তবে হ্যাঁ, নারী যদি শালীরূপিনী হন, তবে আলাদা কথা। শালাগ্রামীজীর বক্তৃতা শেষ হতেই জনতা উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি দিল 'বল বল শালী মাঈকি জয়।' ধ্বনি শুনে শালাগ্রামজী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শালী আবার মাঈজা হয় কী করে? পরে বুঝলেন, ফুল থেকে যেমন ফল, তেমনি শালার পরিণতি মাতৃত্বে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে শালাকে বিবাহ করার বিধান আছে। আর জামাইবাবু না করুন, অন্য কেউ নিশ্চয় তা পারে।

অতএব আশী সাল শালীর সাল। এখন পোয়া বারো শালীদের। তপশীলি উপজাতি সংখ্যালঘু বা অনুন্নত সম্প্রদায় নয়, শালীদের জন্যে চাকরি সংরক্ষিত। প্রতিযোগিতামূলক

পরীক্ষায় যে যতই ভাল ফল দেখাক না কেন, শালী কেউ থাকলে তাকেই পয়লা নম্বর করতে হবে। লোকসভা বিধানসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন শালীদের দিতেই হবে। নারীবর্ষ বলে জনৈকা বিদূষীকে যেমন অবৈধভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে জিইয়ে রাখা হয়েছিল, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পুলিশবাহিনী, পৌরসভা ইত্যাদির সব উচ্চপদ শালী মার্ক: করে রাখা হয়েছে। বাঙালী সমাজে শালীদের নিয়ে বিশেষ মধুর সম্পর্ক রয়েছে বলে পশ্চিমবঙ্গে তাদের জন্যে বিশেষ বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারী ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্যে সর্বত্র কাড়াকাড়ি। কিন্তু রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফ্ল্যাট খালি হলেই শালীদের দেওয়া হবে। দক্ষিণ কলকাতার একটি সরকারী হাউজিং এস্টেটে তিনটি ফ্ল্যাট খালি হয়। দরখাস্ত পড়ে চার হাজার আটশ সাতান্নটি। কিন্তু আন্তর্জাতিক শালী বয়ের প্রতি সম্মান জানাতে তিনটি ফ্ল্যাটই তিনজন মন্ত্রীর সুরসিকা শ্যালিকাকে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ আর একটি ফ্ল্যাট সম্প্রতি খালি হওয়াতে সরকারের পক্ষ থেকে একজন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার খোঁজ করতে নেমেছেন, এবার কোন মন্ত্রার কোন শালীকে এই ফ্ল্যাটটি দেওয়া যায়। রাজ্য মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে নিখিল ভারত শ্যালিকা সংরক্ষণ সমিতি। শিশু উদ্যানের মত কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় শালী উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। শালিমারের মাঠে শালী সম্বর্ধনার এক বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শালীদের মনোরঞ্জনে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁকে শালিবাহন খেতাব দেওয়া হবে। এই উৎসবে যোগ দিতে আসছেন মাও সে তুঙের ভায়রাভায়ের শালী চিয়াং চিং এবং জ্যাক কেনেডির ভায়রাভায়ের শালী জ্যাকেলিন! শালী সম্বর্ধনা উৎসবে একটি উপযুক্ত উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে প্রথমে খোঁজা [illegible] নজরুল গীতি। নজরুল শালী সম্পর্কে কোন গান লিখেছেন কিনা জানার জন্যে ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত কমিটি গঠন করা হল।

অনেক অনুসন্ধানের পর উপযুক্ত গান না পাওয়ায় সুকান্তর কোন কবিতাকে সুর দিয়ে গান করা যায় কিনা তার চেষ্টাও চলে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ। মার্কসবাদী নয় বলে সুকান্তর কোন রচনাতেই শালী শব্দ নেই। অবশেষে আশ্রয় নিতে হল সেই রবীন্দ্রনাথের। প্রচলিত একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অক্ষর মাত্র পরিবর্তন করে উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে গাওয়ার ব্যবস্থা হল। এখন পাড়ায় পাড়ায় গানের ইস্কুলে শেখানো হচ্ছে সেই গান—শুনলো শুনলো শ্যালিকা, রাখ কুসুম মালিকা।

সবই পাকা বন্দোবস্ত। কিন্তু বিপদ হয়েছে আমার। আজ সাত মাসের উপর প্রতি রবিবার পাঠকদের সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া করছি আজব ভাবনা নিয়ে। আন্তর্জাতিক শালীবর্ষের সূচনা হতে আর বাকী নেই। যেহেতু আমি কারো শালী নই, এই জন্মে হওয়ার সম্ভাবনাও নেই, তাই শালীদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিলাম। আজব ভাবনা এখন থেকে থাকুক আমার এবং আপনাদের মনে মনে। ধন্যবাদ।